বাংলার চাষী

শান্তিপ্রিয় বসু

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫২ ॥

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : সুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৩৫৩ ॥

৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫. নভোরশ্মি : ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬. আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৫৭. ভারতের বনৌষধি : ডক্টর শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮. উপনিষদ্ : মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯. শিশুর মন : শ্রীসুধেনলাল ব্রহ্মচারী
৬০. প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদ্‌বিদ্যা : শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

॥ ১৩৫৪ ॥

৬১. ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬২. ভারতশিল্পে মূর্তি : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৩. বাংলার নদনদী : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪. ভারতের অধ্যাত্মবাদ শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫. টাকার বাজার : শ্রীঅতুল সুর
৬৬. হিন্দুসংস্কৃতির স্বরূপ : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

॥ ১৩৫৫ ॥

৬৭. শিক্ষাপ্রকল্প : শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
৬৮. ভারতের রাসায়নিক শিল্প : ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
৬৯. দামোদর পরিকল্পনা : ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০. সাহিত্য-মীমাংসা : শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

বাংলার চাষী

কান্তিপ্রিয় বসু

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১
পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৫৬

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)

সূচী

শ্রীমতী হাসি বসু এই বইখানি লিখতে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।—গ্রন্থকার

রায়তের দারিদ্র্য

বাংলার চাষী দরিদ্র। সামান্য কয়েকখণ্ড জমির উপর তার সারা বৎসরের জীবিকা নির্ভর করে। আবহমান কাল থেকে তারা একই উপায়ে সেই জমি চাষ করে আসছে। বর্তমান যুগের সমুন্নত কৃষিবিদ্যা তাদের স্পর্শমাত্র করেনি। এই শতাব্দীতে কৃষিবিজ্ঞানে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে, তার সাহায্যে ইউরোপ ও আমেরিকার কৃষক-সম্প্রদায়ের অনেকেই প্রভূত সুখ ও সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশের চাষী যে গরিব সে গরিবই রয়ে গেছে। যে কৃষি দ্বারা সে জিবিকানির্বাহ করে তা অতি প্রাচীন এবং নিতান্ত কায়ক্লেশে দিন গুজরানো ছাড়া সহজ জীবন-ধারণের পক্ষে অনুপযুক্ত। লোকসংখ্যাও অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু কৃষি সেই অনুপাতে প্রসার লাভ করেনি। এ ছাড়া দেশে শিল্পব্যবসায়ের অভাব থাকাতে উত্তরোত্তর বর্ধিত লোকসংখ্যা কৃষির আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে জমির উপর যারা নির্ভর করে তাদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই কারণে জমির অভাব দেখা দিয়েছে এবং প্রত্যেক জোতের আয়তন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়ছে। এই ক্ষুদ্র জোত থেকে যা অর্থাগম হয় তাতে একটি চাষী ও তার পরিবারের ভরণপোষণ চলে না। ফলে চাষীরা ঋণ করতে বাধ্য হয়। সুদের হার অত্যন্ত উঁচু, এবং একবার ঋণগ্রস্ত হলে তাদের চীরজীবনই ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকতে হয়। দিনে দিনে সুদ বেড়ে চলে, শেষে নিরুপায় হয়ে নিজের সর্বস্ব জমিটুকু বিক্রি করে চাষী ঋণের দায় থেকে অব্যাহতি পায়। পাওনাদার জমি কিনে নেয় ও এইভাবে চাষীরা জমিহীন কৃষিকর্মীর অবস্থায় পরিণত হয়। তারা হয় অন্যত্র চাষের মজুর হিসাবে খাটে, নয়তো যদি নিজের লাঙল ও গোরুজোড়া

ঋণের হাত থেকে বাঁচাতে পারে তাই নিয়ে যে জমি এককালে নিজের বলে চাষ করেছে সেই জমি পাওনাদারের কাছ থেকে পুনরায় বর্গা নিয়ে চাষ করে।

প্রাচীন কৃষিপ্রথা, জটিল জমি-সংক্রান্ত আইন, মধ্যস্বত্বভোগীর অতিরিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধি খাজনার উচ্চহার, কর্ষণযোগ্য ভূমি ও শ্রমশিল্পের অভাব, কর্ষণাধীন জমির অসম্বদ্ধতা, চিরঋণগ্রস্ততা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই কয়েকটি বিশেষ কারণে বাংলার কৃষক অসামান্য দারিদ্র্যে উপনীত হয়েছে। এ বিষয়ে বহু লেখকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে এবং তাঁরা কৃষকের আয় ও ব্যয়ের নানা হিসাব দেখিয়েছেন। সার্ আজিজুল হক বলেছেন যে, বাংলাদেশের একটি চাষী-পরিবারের গড়পড়তা বার্ষিক আয় যুদ্ধের পূর্বে ছিল ২৮৮৲ টাকা। তখন বাংলাদেশে মোট ৪৩,৪৩,০৬৯ কৃষক পরিবার ছিল। তাঁর মতে ১৯৩৬-৩৭ সালে বাংলার সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হয়েছিল ১২৫,২৮,৭৮,৫৩৫৲ টাকা। ওই মোট আয় যে সমস্ত চাষীর জমি আছে শুধু তাদের মধ্যে ভাগ হয়ে প্রত্যেকে ২৮৮৲ টাকা করে পায়। এখানে লক্ষ্য করা উচিত যে, শস্য উৎপাদনের ব্যয় এই হিসাবে ধরা হয়নি। সেই উৎপাদন-ব্যয় এই আয়ের অঙ্ক থেকে বাদ দিলে প্রকৃত আয় আরও অনেক কম হবে। এ ছাড়া যাদের জমি আছে শুধু তাদের নিয়ে হিসাব ধরা হয়েছে। কিন্তু তারা বাংলার কৃষিজীবী লোকসংখ্যার একটি অংশ মাত্র। ফ্লাড (Floud) কমিশনের বিবরণীতে প্রতি চাষী-পরিবারের আয় দেখানো হয়েছে বার্ষিক ২২৫৲ টাকা। এস্থলে সকল শ্রেণীর কৃষিজীবীদের নিয়ে একটি গড়পড়তা হিসাব করা হয়েছে। কৃষিজাত দ্রব্যের মোট আয় অনুমান করা হয় ১৪৩ কোটি টাকা এবং তা ভাগ করলে জন-প্রতি প্রত্যেক চাষী পায় বৎসরে ৪৩৲ টাকা। আবার ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি যে হিসাবপত্র প্রকাশ করেন, তাতে দেখা যায় যে

প্রতি পরিবারের আয় গড়ে ছিল ৪০৬৲ টাকা এবং তা ১০ বৎসর পরে ফ্লাড্ কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশিত ২২৫৲ টাকার প্রায় সমান ছিল ধরা যায়। কারণ ১৯৩৯ সালে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯২৯ সালের মূল্য হতে অনেক কম ছিল।

ফ্লাড্ কমিশন ও ব্যাঙ্কিং এন্কোয়ারি কমিটি উভয়েরই হিসাবে চাষীদের সকল শ্রেণীকে ধরা হয়েছে এবং একটি গড় হিসাব করা হয়েছে। কিন্তু এই শ্রেণীগুলির মধ্যে অর্থগত অনেক বিভেদ আছে। কোনো চাষীর বিস্তৃত চাষের জমি আছে, এবং সেজন্য তার অবস্থা সমৃদ্ধিসম্পন্ন। কোনো চাষীর সামান্য কয়েক বিঘা জমি, এবং সাধারণ অবস্থায় তাতে তার কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনটুকু জোটে। তারপরে আছে ভাগীদার, যার গোরু লাঙল প্রভৃতি আছে কিন্তু জমি একেবারেই নেই অথবা নামমাত্র আছে। সে জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে এবং উৎপন্ন ফসল জমির মালিক ও নিজের মধ্যে ভাগ করে নেয়। সবশেষে আছে জমিহীন কৃষিমজুর। তার নিজের জমি নেই, অন্য লোকের জমিতে দৈনিক মজুর হিসাবে চাষ-আবাদের কাজ ক'রে জীবন ধারণ করে। দেখা যাচ্ছে যে বাংলার চাষীদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের শ্রেণী বিদ্যমান এবং তাদের একটি ও অপরের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রভেদ অনেক। সুতরাং এই শ্রেণীগুলির গড়পড়তা আয়ের হিসাব নিভু'ল হলেও তা থেকে চাষীদের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। প্রকৃত অবস্থা জানতে হলে শ্রেণীগুলিকে ভিন্নভাবে নিয়ে তাদের আয়ব্যয়ের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

১৯৩৭ সালে বীরভূম জেলার কয়েকটি গ্রামে প্রত্যেক পরিবারের আর্থিক আয়ব্যয়ের অনুসন্ধান করা হয়। মোট ৬৮০টি পরিবার থেকে তাদের বাৎসরিক আয় ও খরচাদির হিসাব নেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৯০টি পরিবার ছিল যারা নিজের জমি নিজেরাই চাষ করে। ১১৩

জন ছিল যারা জমির মালিক কিন্তু নিজেরা চাষ করে না। এ ছাড়া এই শ্রেণীর ৩০জন স্ত্রীলোক ছিল। ভাগীদার ছিল ১৪৬, কৃষাণ ৭৫টি ও কৃষিমজুর ১৩৮। চাকুরিজীবী ৪২, ব্যবসায়ী ১৮, কারিগর ১৫ ও অন্যান্য ১৩। এই শ্রেণীগুলির আয়ব্যয়ের হিসাব জানার পূর্বে তারা অর্থনৈতিক কোন্ স্তরে অবস্থান করে তা জানা শ্রেয়।

১ ক। নিজেরা চাষ করে না অথচ সুবিস্তৃত কর্ষণাধীন জমি অধিকারে আছে এমন শ্রেণীর কৃষিজীবীরা সাধারণত অবস্থাপন্ন। ভাগীদার বা কৃষাণদের মধ্যে তারা উচ্চহারে শস্য-খাজনা নিয়ে জমি বিলি করে দেয়। কখনো এরা স্থায়ী মজুরের দ্বারা চাষের কাজ সম্পাদন করে। গ্রামের মধ্যে এদের অবস্থাই সকলের চেয়ে সমৃদ্ধ। উত্তর-বঙ্গের জোতদারগণ এই শ্রেণীভুক্ত।

১ খ। সচরাচর মালিক-চাষী শ্রেণীর হলেও কয়েকটি স্ত্রীলোককে উপযুক্ত শ্রেণীসংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যেহেতু ঘরে পুরুষকর্মীর অভাবে তারা নিজেদের জমি বিলি করে দিতে বাধ্য হয় এবং শুধু ফসলের অংশ উপভোগ করে।

২। মালিক-চাষী—যাদের অল্প কয়েক বিঘা জমি, গোরু ও লাঙল ইত্যাদি কৃষির যন্ত্রপাতি আছে। তারা পরিবারের সকলে মিলে জমি চাষ করে। শুধু কাজ যখন অত্যন্ত বেড়ে যায়, যেমন ধান রোয়া বা ধান কাটার সময় দিনমজুর রেখে অতিরিক্ত লোকের সাহায্য গ্রহণ করে।

৩। ভাগীদার—এদের নিজের জমি হয়তো একেবারেই থাকে না কিংবা থাকলেও এত অল্প যে অন্য লোকের কাছ থেকে তাকে কিছু জমি বর্গা নিতেই হয়। চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ গোরু, লাঙল ইত্যাদি তার থাকে। ফসল হলে জমির মালিকের সঙ্গে তা আধাআধি ভাগ করে নেয় এবং সেইজন্যই তাকে বলা হয় ভাগীদার। এই শ্রেণী বর্গাদার বা ভাগচাষী নামেও অভিহিত হয়ে থাকে।

৪। কৃষাণ— বীরভূম জেলায় যে জমিহীন চাষীর একটি শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায় সেই শ্রেণীর চাষীদের কৃষাণ বলা হয়। তাদের জমি, গোরু বা লাঙল কিছুই থাকে না এবং বাৎসরিক হিসাবে তারা জমি বন্দোবস্ত নেয়। বীজ হতে গোরু, লাঙল প্রভৃতি সমস্ত উপকরণ মালিকের কাছ থেকে গ্রহণ করে। শুধু শারীরিক শ্রমটুকু তাদের নিজের। বৎসরান্তে ফসলের $\frac{১}{৩}$ নিজেরা রেখে বাকি ২ ভাগ জমির মালিকের হাতে অর্পণ করে।

৫। কৃষিমজুর—কৃষিমজুরদের জমি কোনো সময়েই থাকে না। তারা শুধু দৈনিক মজুর হিসাবে অন্য চাষীর চাষের কাজে সাহায্য করে।

আরও কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে যাদের পেশা চাকুরি, ব্যবসায়, কারিগরি বা অন্যান্য। এই সবের উপরেই তাদের আর্থিক আয় নির্ভর করে বলে তাদের সম্বন্ধে আর বিস্তৃতভাবে বলা হয়নি। নীচের তালিকায় উক্ত ৬টি শ্রেণীর ১৯৩৬-৩৭ সালের আয়-ব্যয়ের গড় হিসাব দেওয়া হল :

	১ক	১খ	২	৩	৪	৫
	জমির মালিক কিন্তু চাষ করে না (টাকা)	জমির মালিক কিন্তু চাষ করে না- স্ত্রীলোক টাকা)	মালিক-চাষী (টাকা)	ভাগীদার (টাকা)	কৃষাণ (টাকা)	কৃষিমজুর (টাকা)
খাদ্যদ্রব্য	১৮১·৭	৫০·৭	১৫৬·৯	১০৯·১	৯১·৮	৬৭·৭
কাঠ, কেরোসিন…	১৮·০	৭·৬	১৪·০	৯·৬	৮·৯	৮·১
বস্ত্রাদি	২৬·৩	৪·৮	১৯·০	১০·৯	৮·০	৬·৯
শিক্ষা	৬·২	×	৩·০	০·৬	০·০৬	০·০৭
স্বাস্থ্য	৭·২	১·১	১২·২	১·৭	১·০	১·২
খাজনা, সেস…	৪১·৭	১৮·৯	২১·৪	৩·১	১·৩	১·২
মামলা মকদ্দমা	৫·৯	০·৫	১·৩	০·২	×	০·২
ব্যবসায়	১০৬·৮	১২·০	৫·২	×	২·৮	০·০৬
বেতন	৩·১	০·৩	০·১	০·১	০·০৩	০·০২
ঋণ পরিশোধ	৫৪·৬	১৪·১	৪৯·৬	২৭·২	২৬·৩	২·৭
ঋণ দান	১৩·৪	৩·৭	১·৭	১·২	০·৬	০·০৭
কৃষিব্যয়	৯৫·৩	১২·৫	৬২·৪	২৮·৫	৬·৩	২·৮
শিল্পকর্ম	৫·২	০·২	৪·৮	০·০২	×	০·০৭
অন্যান্য ব্যয়	১১৯·৫	৯·০	৩৯·০	১৯·৬	১০·৬	১০·৫
মোট ব্যয়	৬৮৪·৯	১৪৬·৩	৩৯০·৬	২১২·০	১৫৭·৭	১০১·৬
মোট আয়	৬০৮·৪	·৪৮·১	৩৯৪·২	২০৬·৫	১৪৫	৯৩·১

এই তালিকার অর্থ আরও সুস্পষ্ট হবে যদি যে সকল খাদ্যদ্রব্য গ্রামবাসীরা সচরাচর ক্রয় করে তার সেই সালের মূল্য জানা থাকে।

সেই উদ্দেশ্যে নীচে ১৯৩৬-৩৭ সালের দ্রব্যাদির মূল্য-তালিকা দেওয়া গেল :

	মনপ্রতি		মনপ্রতি
চাল	৩৷৹	লবণ	২৲
মসুরী	৪৲	চিনি	৮৷৹
আটা	৪৸৶৹	গুড়	৩৲
ময়দা	৬৲	সরিষার তেল	১৪।৫
ঘি	৩৮।৶৹	কেরোসিন	৩৶৹ প্রতি টিন

শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে আর্থিক বৈষম্য অনেক তা তালিকায় প্রথম দৃষ্টিপাতেই ধরা পড়ে। আয়ের অনুপাতে প্রথম হচ্ছে সেই শ্রেণী যাদের জমি আছে অথচ নিজেরা চাষ করে না। তাদের বার্ষিক আয় হয়েছিল ৬০৮.৪৲ টাকা ব্যয় হয় ৬৮৪.৯৲ টাকা। ওই বৎসরে এই শ্রেণী যত রোজগার করেছে খরচ করেছে তার চেয়ে বেশি। তার কারণ এই যে, এই শ্রেণী অনায়াসে কিছু টাকা ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসাবে তুলে রাখতে পারে। এই সমৃদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু কৃষিকর্মে বিমুখ গৃহস্থের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং কেবল সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, তাদের এক-একজন উত্তরোত্তর বিত্তশালী হয়ে উঠছে।

দ্বিতীয় মালিক চাষী। তাদের আয় ৩৯৪.২৲ টাকা ও ব্যয় ৩৯০.৬৲ টাকা। এদের আয় প্রথম শ্রেণীর আয়ের চাইতে কম কিন্তু ভাগীদারদের চেয়ে এদের অবস্থা ভালো দেখা যায়। ভাগীদারদের আয় হয়েছিল ২০৬.৫৲ টাকা ও ব্যয় হয় ২১২.০৲ টাকা। কৃষাণরা ভাগীদারদের চেয়েও গরিব। তাদের রোজগার বৎসরে ১৪৫.৯৲ টাকা; খরচ ১৫৭.৭৲ টাকা। সকলের শেষে জমিহীন কৃষিমজুরের শ্রেণী। এরা পরিশ্রম করে সবার চাইতে বেশি কিন্তু বাৎসরিক আয় হয় মাত্র ৯৩.১৲ টাকা ও খরচ ১০১.৬৲ টাকা।

এখন ব্যয়ের অঙ্ক সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা দরকার। একটি কৃষিমজুর তার বাৎসরিক ব্যয় ১০১'৬৲ টাকার মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় করে ৬৭'৭৲ টাকা। যদি তার পরিবারে ৫ জন লোক থাকে তা-হলে জন-প্রতি খাবার খরচা পড়ে বার্ষিক ১৩॥০ টাকা এবং মাসিক হিসাবে হয় ১৲ টাকার একটু বেশি। ১৲ টাকায় যতখানি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা যায় তাতে জিনিসের দাম ১৯৩৬-৩৭ সালের মতো সস্তা হলেও এক মাসের উপযুক্ত খাদ্য হয় না। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা খাদ্যদ্রব্যাদিতে এর প্রায় ৩ গুণ ব্যয় করে; দ্বিতীয় শ্রেণী ২½ গুণের কিছু কম, ভাগীদারদের ১½ গুণ এবং কৃষাণদের ব্যয় মজুরদের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি। সার্ আজিজুল হক তাঁর *Behind The Plough* বইতে উল্লেখ করেছেন যে, ধান ও লবণের মূল্য যখন মনপ্রতি ১॥০ ও ২॥০ হয়, ও তেল প্রতি সের ।৵০, তখন পাঁচ জন লোকের একটি পরিবারের খাদ্যের খরচ হয় ১২১৵১০। এই হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে, শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা পেট ভরে খেতে পায়। পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সার্ আজিজুল বলেছেন যে, যখন ধুতির দাম হয় একখানা ॥৵০, শাড়ি ১৲ ও গামছা ৵০, তখন একটি পরিবারের পাঁচ জন লোকের জন্য ব্যয় হয় বার্ষিক ১৮।০। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী প্রয়োজনমত কাপড়চোপড় কিনতে সক্ষম হয়। অন্যান্য সকলে বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পায়। উল্লিখিত তালিকা থেকে মোটের উপরে এই বোঝা যায় যে, বাংলার কৃষিজীবীদের অধিকাংশ লোক জীবনধারণের পক্ষে প্রথম প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বস্ত্র এই দুইটি জিনিসেরই অভাব ভোগ করে। শিক্ষার জন্য তারা যা ব্যয় করতে পারে তা নগণ্য। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এক কপর্দকও ব্যয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

১৯৪১ সালের যে আদমশুমারি প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে

কৃষিজীবীদের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকসংখ্যা জানা যায়। নীচে সেই সংখ্যার তালিকা উদ্ধৃত করা হল :

	আয়ের প্রধান উপায়	আয়ের আনুষঙ্গিক উপায়
জমির মালিক, খাজনার উপর নির্ভরশীল	১,১৯৬,৬৫০ (২৩,৯৩৩)	১১১,৪০০ (২,২৪৮)
ভাগীদার	৯৩৪,৫০০ (১৮,৬৯০)	২৭৩,২৫০ (৫,৪৬৫)
রায়ত ও কোর্ফারায়ত	৫,৭১৪,৬৫০ (১১৪,২৯৩)	৪৪২,২৫০ (৮,৮৪৫)
কৃষিমজুর	১,৭৪৫,২৫০ (৩৪,৯০৫)	১৩৩,৪৫০ (২,৬৬৯)

বন্ধনীযুক্ত সংখ্যাগুলি আদমশুমারিতে লিখিত আছে। প্রত্যেক ৫০ জনের মধ্য থেকে একজন করে "র‍্যান্‌ডম্ স্যাম্পল" নেওয়া হয়েছিল। এই নিয়মে ওই সংখ্যা ধরা হয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা জানার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটিকে ৫০ দিয়ে গুণ করে আলাদা করে দেখানো হল। বলা বাহুল্য, এই সংখ্যার মধ্যে চাষীর পোষ্য পরিজনবর্গের সংখ্যা ধরা হয়নি।

কৃষিজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধি

জমির উপর চাপ অত্যধিক হওয়াতে বাংলার কৃষক বিনাশের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন একদিন ছিল যখন লোকসংখ্যা কম ছিল, গ্রামের মধ্যে একটি অর্থসমতা বজায় থাকত। প্রত্যেক গ্রামেই কতক লোক কৃষিকার্যে ব্যাপৃত থাকত, এতে গ্রামের লোকের সকলের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব মিটে যেত এবং নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলি সরবরাহের জন্য তাঁতী, কুমোর, কলু, কামার প্রভৃতি শিল্পীগণ এক গ্রামে বাস করত। এ ভাবে একদল কৃষির কাজ ও আর-একদল শিল্প কাজের ভার নেওয়াতে

একটি সুন্দর শ্রমবিভাগ তখন আমাদের গ্রামগুলিতে ছিল। এবং যদিও সে সময়কার গ্রামবাসী সাধারণের আর্থিক অবস্থা উন্নত ছিল বলা যায় না তবু এটুকু বলা যায় যে তারা যথেষ্ট খেয়ে-পরে ছিল। এ অনেককাল আগের কথা। এর পরে এল অন্য যুগ, যখন পশ্চিম হতে, বিশেষ করে ইংলণ্ড থেকে, আমদানি হতে লাগল সস্তা শিল্পজাত দ্রব্য এবং কিছুকাল পরে সেগুলি জাপান ও অন্যান্য দেশ থেকেও আসতে শুরু হল। গ্রাম্য শিল্পীরা সেই বিদেশী সস্তা মালের সঙ্গে আর কিছুতেই প্রতিযোগিতা করে উঠতে পারল না এবং অচিরেই তারা কর্মহীন হয়ে পড়ল। জীবিকা অর্জনের অন্য কোনো উপায় বর্তমান না থাকাতে একমাত্র কৃষিকেই তারা আশ্রয় করতে বাধ্য হল।

বাংলার লোকসমষ্টি ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। গত আদমশুমারি অনুসারে লোকসংখ্যা ৬,১৪,৬০,৩৭৭ এবং প্রতি বর্গমাইলে ৭৪১। গত সত্তর বৎসরের লোকসংখ্যা ও প্রতি বর্গমাইলের লোকসংখ্যার তালিকা নীচে দেওয়া হল :

বৎসর	কোটি	লক্ষ	প্রতি বর্গমাইলের লোকসংখ্যা	বৎসর	কোটি	লক্ষ	প্রতি বর্গমাইলের লোকসংখ্যা
১৮৭২	৩	৪৬	৪২২	১৯১১	৪	৬৩	৫৬৩
১৮৮১	৩	৭০	৪৫০	১৯২১	৪	৭৫	৫৭৮
১৮৯১	৩	৯৮	৪৮৪	১৯৩১	৫	১০	৬১৬
১৯০১	৪	২৮	৫২১	১৯৪১	৬	১৪	৭৪১

প্রতি বর্গমাইলে যে লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তা এই তালিকা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। এই সংখ্যা যে কত বেশি তা আরও পরিষ্কার বোঝা যাবে যদি অন্যান্য দেশের প্রতি বর্গমাইলে জনবসতির ঘনতার সঙ্গে এর তুলনা করি :

ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স	৬৮৫	জাপান	২১৫
হল্যাণ্ড	৫৪৪	ফ্রান্স	১৮৪
জার্মেনি	৩৩২	স্পেন	১০৭

বাংলাদেশের লোকসংখ্যা যে অত্যধিক বেড়েছে তা সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই লোকবৃদ্ধির ভিতর দিয়ে দুইটি বিশিষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তার বিশদভাবে আলোচনা হওয়া দরকার।

প্রথমত সমগ্র লোকসংখ্যার অনুপাতে অধিকতর লোক কৃষিকার্য অবলম্বন করছে। যে দেশে শ্রমশিল্প ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করছে সে দেশে উত্তরোত্তর বর্ধিত লোকাংশ সহজেই শিল্পের কাজে নিযুক্ত হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে শিল্প সেভাবে গড়ে উঠছে না এবং তাতে কৃষি-অবলম্বী লোকের শতকরা হার কেবলই বেড়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারি কমিটি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বলেছেন, "ভারতবর্ষে কৃষিজীবীগণ লোকসংখ্যার অনুপাতে অত্যন্ত বেশি এবং এই অনুপাতে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ১৮৯১ সালে তা ছিল শতকরা ৬১, এবং পরে বেড়ে গিয়ে ১৯০১ সালে হয় শতকরা ৬৬ ও ১৯২১ সালে শতকরা ৭৩। ১৯৩১ সালের আদমশুমারি আমাদের হস্তগত হয়নি কিন্তু ন্যায্যত ধরে নেওয়া যায় যে, ১৯৩১ সালে এই শতকরা হার আরও বেড়ে গিয়েছে।"

১৯৩১ সালে লোকসংখ্যার সমানুপাত তার পূর্ব বৎসরের মতনই শতকরা ৭৩ ছিল। উপরের মন্তব্য সমগ্র ভারতবর্ষের বিষয়ে করা হয়েছিল সত্য কিন্তু বাংলাদেশ সম্বন্ধে তা অধিকতর ভাবে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশে একদিকে কেবল কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা যেমন বেড়ে যাচ্ছে অন্যদিকে শিল্পকর্মাশ্রিত লোকের সংখ্যা ঠিক তেমন কমে আসছে। এ একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এই যুগে যখন পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশে শ্রমশিল্প দ্রুততালে এগিয়ে যাচ্ছে তখন বাংলা দেশে ঘটছে ঠিক তার বিপরীত। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর লিখিত *Food Planning for Four Hundred Millions* বইতে বাংলাদেশে শিল্পকর্মীর সংখ্যা ক্রমশ যে কমে গিয়েছে তা নির্দেশ করে একটি তালিকা দিয়েছেন :

	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
লোকসংখ্যা (লক্ষ)	৪৬৩	৪৭৫	৫১০
কর্মীসংখ্যা (লক্ষ)	১৬২	১৬৮	১৪৭
শ্রমশিল্পীর সংখ্যা (লক্ষ)	১৭	১৭	১৩
কর্মী লোকসংখ্যার মধ্যে শ্রমশিল্পীর শতকরা হার	১০.৫	১০.১	৯.০
সমগ্র লোকসংখ্যার মধ্যে শ্রমশিল্পীর শতকরা হার	৩.৯	৩.৭	২.৫

দেখা যায় যে ১৯১১ সাল থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা ৪৬৩ লক্ষ থেকে ৫১০ লক্ষ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রমশিল্পীর সংখ্যা একটুকুও বাড়েনি, বরঞ্চ বিপরীত হয়েছে। সমগ্র লোকসংখ্যা ও কর্মীসংখ্যার মধ্যে শ্রমশিল্পীগণের শতকরা হার ক্রমেই নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। এতে এই প্রমাণ হয় যে, বাংলাদেশে শ্রমশিল্প ক্রমে কমে আসছে। শ্রমজীবিদের সংখ্যা না কমে যদি সমানও থাকত তাহলেও প্রমাণ হয় যে শিল্প ক্রমশ হ্রাস হচ্ছে, কারণ উক্ত সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের দৈনিক কার্যকাল ১২ ঘন্টা থেকে ৯ ঘন্টা করা হয়েছিল।

কৃষিকর্মে লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের শ্রমশিল্পগুলিও নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং জমির চাহিদাও অত্যধিক বেড়েছে। কিন্তু এতগুলি লোকের ভরণপোষণের উপযুক্ত জমি আর পাওয়া যাচ্ছে না। অতিরিক্ত লোক কৃষির উপর নির্ভর করে বলে স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই লোকসমস্যা নিয়ে কয়েকজন লেখক বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে অতিপ্রজতা দারিদ্র্যের মূল কারণ এবং সে দারিদ্র্য নিবারণের জন্য লোকসংখ্যা হ্রাস করা ভিন্ন আর কোনো উপায় প্রস্তাব করতে তাঁরা সক্ষম হননি,

হালকাভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ, দেশান্তরে বসতি স্থাপন ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন মাত্র। ফ্লাড্ কমিশন, অবস্থা সম্পূর্ণ আশাহীন বলে সমস্যা এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁদের বিবৃতিতে আছে, "আমাদের মতে জমির উপর লোকসংখ্যার অত্যধিক চাপই মূলত বাংলাদেশের আর্থিক অবনতির কারণ। বর্তমান ব্যবস্থায় এর কোনো প্রতিকার সম্ভব নয়, এই সমস্যা অত্যন্ত কঠিন।"

কিন্তু প্রকৃত সমস্যা এই নয় যে, লোকসংখ্যা অধিক হওয়াতে সকলে যথেষ্ট খেয়ে-পরে থাকতে পারে না, আসল সমস্যা হচ্ছে যে কেবল জমির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হয়ে পড়েছে। দেশে প্রকৃতভাবে শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়নি এবং যা সামান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলি উদ্বৃত্ত লোকসংখ্যার ভার গ্রহণে অসমর্থ। শিল্প প্রতিষ্ঠার সমস্যা হচ্ছে আসল। অতিপ্রজতা সর্বদাই একটি সমস্যা বলে ধরা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি সমস্যাই নয়। একটি বৃহৎ লোকসমষ্টিকে জমি থেকে সরিয়ে নিয়ে শিল্পের কাজে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। চাষীদের দারিদ্র্য মোচন করতে হলে লোকসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে শিল্পকেও সেই সঙ্গে ততটা বিস্তার করতে হবে। এই সম্বন্ধে গ্রেটব্রিটেনকে আমরা উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করতে পারি। সে দেশের লোক-বসতি বাংলা-দেশের মতনই অত্যন্ত ঘন। কিন্তু সেখানে মাথাপিছু বার্ষিক আয় আমাদের দেশের চেয়ে ১৭ গুণ বেশি। এর কারণ বুঝতে বেগ পেতে হয় না। গ্রেটব্রিটেন এক শিল্পসমৃদ্ধ দেশ এবং সেখানকার সমগ্র লোকসমষ্টির শতকরা ৭ ভাগ কৃষিকর্মে নিযুক্ত, সেস্থলে বাংলাদেশে শতকরা ৭৬ জন কৃষিজীবী। এখানে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না যে, ইংলণ্ড ও ওয়েল্সের লোকসংখ্যা ১৮৭০ ও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ২ কোটি ২৮ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ হয়েছে। প্রায় সেই সময়ের

মধ্যেই বাংলাদেশে ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ থেকে ৫ কোটি ১০ লক্ষ বৃদ্ধি দেখা যায়।

জাপানও শিল্পের দ্বারা অতিপ্রজতার সমস্যার সমাধান করেছে। সেখানকার লোকসংখ্যা ৬ কোটি ৬৩ লক্ষ এবং বাংলার লোকসংখ্যা ৬ কোটি ১৪ লক্ষ। জাপানের কর্ষণাধীন জমি ২ কোটি ৩৯ লক্ষ একর ও বাংলার জমি ২ কোটি ৭ লক্ষ একর। জাপানে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোক কৃষিজীবী এবং বাংলাদেশেও চাষীর সংখ্যা সেই অনুপাতেই। কিন্তু জাপানের গড়পড়তা আয় বাংলার চাষীর আয় অপেক্ষা অনেক বেশি। তার কারণ আর কিছুই নয় জাপানের চাষীদের মধ্যে শতকরা ৮৮ জন কৃষি ভিন্ন অন্য উপায়েও অর্থ উপার্জন করে।

জমির অভাব

বর্তমানে বাংলাদেশে কর্ষণযোগ্য ভূমির অত্যন্ত অভাব দেখা দিয়েছে। সমগ্র কর্ষণাধীন জমি যদি সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যায় তবে প্রত্যেক লোক মাত্র ০·৪৪ একর জমি পায়। কি ভাবে এই হিসাবটি পাওয়া গিয়েছে তা পরে উল্লেখ করা হল। বাংলাদেশে মাথাপিছু চাষের জমি কত কম তা অন্যান্য দেশের জমির সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায়। জাপানের মাথাপিছু জমি আছে ০·৩৬ একর, চীনে ০·৪৪, ভারতবর্ষে ০·৭৮, সোভিয়েট রাশিয়ায় ৪·২, যুক্তরাষ্ট্রে ৩·৩ এবং ক্যানাডায় ২৮·৯ একর। এই দেশগুলির মধ্যে জাপান সোভিয়েট রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র শ্রমশিল্পে সমুন্নত। সে কারণে জমি কম-বেশি হলেও তাতে তাদের আর্থিক অবস্থার ব্যাঘাত ঘটে না; প্রকৃত পক্ষে তাদের অবস্থা স্বচ্ছল। তা সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়ায় ৪·২ একর এবং যুক্তরাষ্ট্রে যে ৩·৩ একর মাথাপিছু জমি দেখতে পাওয়া যায় বাংলার চাষের জমির তুলনায় তা অনেক বেশি। কেবল চীনদেশে দেখা যায় যে জমি মাথাপিছু

মাত্র ০'৪৪ একর এবং তা বাংলাদেশে জমির হারের সমান। সে দেশে শিল্প এখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। তার ফলে বাংলার চাষীদের মতই তারা অসামান্য দারিদ্র্য ভোগ করে। কানাডাতে জমির হার সর্বোচ্চ এবং সেখানে বেশির ভাগ লোক কৃষিজীবী। কিন্তু সে সত্ত্বেও সেখানকার লোকের অবস্থা বেশ সমৃদ্ধ। তার কারণ একমাত্র এই যে লোকসংখ্যার অনুপাতে সেখানে চাষের জমি অনেকগুণে বেশি।

বাংলাদেশের মোট কর্ষণাধীন ভূমির পরিমাণ হচ্ছে ২ কোটি ৭০ লক্ষ একর। ১৯৪১ সালে অধিবাসী ছিল মোট ৬ কোটি ১৪ লক্ষ। সুতরাং জনপ্রতি চাষের জমির পরিমাণ হয় ০'৪৪ একর। কর্ষণাধীন ভূমি দেশের সমস্ত লোকের মধ্যে ভাগ করে উক্ত ফল পাওয়া যায়। কিন্তু দেশের সকল লোকই কৃষিজীবী নয় সুতরাং শুধু কৃষিজীবীর সংখ্যা দিয়ে সমস্ত চাষের জমি ভাগ দিলে প্রকৃতপক্ষে চাষীদের মাথাপিছু জমির হিসাব পাওয়া যাবে।

১৯৪১ সনের আদমশুমারিতে বাংলাদেশে যত লোক কাঁচামাল প্রস্তুত করে তাদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের সংখ্যা ও কৃষিজীবীদের সংখ্যা প্রায় একই হওয়ার কথা, যেহেতু কাঁচামাল-প্রস্তুতকারীগণ অধিকাংশই কৃষিজীবী। ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে ১ কোটি ৬ লক্ষ লোক কাঁচামাল উৎপন্নে নিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে ৪৪, ৫৯৩ জন ব্যতীত সকলেই কৃষি এবং কৃষিসংক্রান্ত কাজে ব্যাপৃত ছিল। ১৯৪১ সালের আদমশুমারিতে এরূপ বিস্তারিত হিসাব দেওয়া হয় নাই। আদমশুমারিতে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ আছে :

কাঁচামাল উৎপাদন যাদের উপজীবিকা	১৭৭,৮৩৩
প্রধানত কাঁচামাল-উৎপাদক কিন্তু অন্য উপায়েও যারা জীবিকা অর্জন করে	২৪,৩৩৪
অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জন ও আংশিক ভাবে যারা কাঁচামাল উৎপাদন করে	১৯,৬৭৬
	মোট ২২১,৮৪৩
উক্ত কর্মীদের আয়ে আংশিক নির্ভরশীল	১২,০১২
উক্ত কর্মীদের আয়ে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল	৭০২,১০০
	মোট ৭১৪,১১২

এই হিসাবগুলি তৈরি হয়েছে যত লোকসংখ্যা গণনা করা হয়েছিল তাদের প্রত্যেক ৫০ জনের মধ্যে ১ জনকে র‍্যান্ডম্ স্যামপ্লিংএর নিয়ম অনুসারে নিয়ে। সুতরাং প্রকৃত সংখ্যা জানতে হ'লে এই সংখ্যাগুলিকে ৫০ দিয়ে গুণ দিতে হবে। তার ফলে দেখা যায় যে ১ কোটি ১০ লক্ষ লোক কাঁচামাল উৎপাদন করে এবং তাদের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ। সুতরাং কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের মোট সংখ্যা হচ্ছে ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ এবং মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণ হয় ০·৫৮ একর। এই আদমশুমারিতেই লেখা আছে যে, বাংলাদেশে প্রতি ১০০০ বাড়িতে ৫৪১২ জন লোক থাকে। তার অর্থ প্রত্যেক পরিবারের লোকসংখ্যা ৫·৪ জন। এই হিসাবে প্রত্যেক চাষীপরিবারের জমির আয়তন হয় ৩·১৩ একর। কে. বি. সাহা তাঁহার পুস্তক *Economics of Rural Bengal*এ প্রতি চাষী-পরিবারের জমি ৪ একর বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি ১৯২১ সনের আদমশুমারি অনুসারে হিসাব করেছিলেন। ১৯৪১ সনের লোকসংখ্যার চেয়ে তখনকার লোকসংখ্যা অনেক কম ছিল এবং তারপরে জনপ্রতি চাষের জমির

পরিমাণও কমে গিয়েছে। ফ্লাড্ কমিশন গ্রামের লোকের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন। বাংলাদেশের সর্বত্র মোট ১৯,৫৯৯টি পরিবারের বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়। দেখা যায় যে গড়ে প্রত্যেক পরিবারের চাষের জমি আছে ৪·৩৬ একর। পূর্বোক্ত হিসাবের পরিমাণের চেয়ে এর পরিমাণ কিছু বেশি। পরে যে তালিকা দেওয়া হল তা থেকে দেখা যাবে যে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় পরিবার-প্রতি জমির পরিমাণের খুব তফাত হয়। ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায় ক্রমান্বয়ে ১·৬৩, ২·১৭, ২·১৩ ও ২·২২ একর মাত্র এবং অন্যদিকে বাঁকুড়া জেলায় ৮·১৭ একর, দিনাজপুরে ৬·৩৮ ও জলপাইগুড়িতে ৮·৭৬ একর। এই অনুসন্ধান যে সমস্ত স্থানে করা হয় সেই সমস্ত স্থান সংখ্যাবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে গ্রহণ করা হয়নি। সে কারণে সম্ভবত পারিবারিক জমির গড় পরিমাণ বেশি হয়েছে।

পরিবারে ৫ জন লোক হলে ৪·৫ একর চাষের জমিতে সকলের ভরণপোষণ কিরূপ চলিতে পারে তা পরীক্ষা করে দেখা যাক। চাষী তার জমিতে ধানই বেশি উৎপন্ন করবে, যেহেতু বাংলাদেশের শতকরা ৮৭ ভাগ জমিতে শুধু ধান জন্মে। বছরে ৭৫ মন ধান তার জোত থেকে উৎপন্ন হতে পারে। তা থেকে পরিবারের সারা বৎসরের খোরাক ৩৭½ মন রেখে দিতে হয়। জনপ্রতি বৎসরে গড়ে ৫ মন চাল প্রয়োজন হয় এবং ২৫ মন চালের জন্য ৩৭½ মন ধানের দরকার হয়। বাকি ৩৭½ মন সে বাজারে বিক্রয় করতে পারে। ধানের দাম মনপ্রতি ২৲ টাকা হলে তা বিক্রয় করে ৭৫৲ টাকা পায়।*

* যুদ্ধের পূর্বে কয়েক বৎসরের চালের মূল্য মনপ্রতি

১৯৩১-৩২	৪৴০
১৯৩২-৩৩	৩৷৴০
১৯৩৩-৩৪	২৷৵০
১৯৩৪-৩৫	৩৲
১৯৩৫-৩৬	৩৷০
১৯৩৬-৩৭	৩৷৷০
১৯৩৭-৩৮	৩৷৷৵০ গড়—৩৷৴১০

দেড়মন ধানে একমন চাল হয়, এই হিসাবে ধানের দাম প্রতিমন প্রায় ২৲ টাকা হয়।

এ ছাড়া চাষীরা আখ,পাট, তামাক, তৈলবীজ প্রভৃতি শস্য বিক্রয় করে বছরে অন্তত ৬০৲ টাকা আয় করে। এই মোট ১৩৫৲ টাকা দিয়ে তাদের ধান ভিন্ন যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যয়ভার বহন করতে হয়। এর থেকে খাজনা, ঋণশোধ, শস্যের বীজের মূল্য প্রভৃতি দিতে হয়। চাষের অন্যান্য খরচা—লাঙল, জোয়াল, গোরুর খাদ্যও এই টাকা থেকেই চালাতে হয়। মজুরি বাদ দিয়ে শস্য উৎপাদনের ব্যয় ও খাজনার টাকা নিয়ে মোট হয় ৫০৲ টাকা। এর সঙ্গে বার্ষিক ঋণের সুদ ২৫৲ টাকা যোগ করতে হবে। এই সুদের অঙ্ক মহাজনেরা চাষী-শ্রেণীর কাছ থেকে মোট যত টাকা সুদ হিসাবে পায় তার থেকে হিসাব করে নেওয়া হয়েছে। যদি সমস্ত বাকি ঋণের আসল ১২ বৎসরের মধ্যে শোধ করা সম্ভব হয় তবে তার দরুন চাষীদের গড়ে বৎসরে ১৫৲ টাকা করে দিতে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ১৩৫৲ টাকার মধ্যে একটি চাষীর মাত্র ৪৫৲ টাকা হাতে থাকে। এই টাকা সে পরিবারের খাওয়া-পরার জন্য খরচ করতে পারে। বৎসরে ৪৫৲ টাকা হলে, মাসে পরিবারের প্রত্যেকের হিসাবে পড়ে মাত্র ৸০ আনা। চালের খরচা বাদ দিলেও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কিনবার পক্ষে মাসিক মাত্র ৸০ আনা যে অকিঞ্চিৎকর তা বলা নিষ্প্রয়োজন। চাল ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে লবণ, তৈল, ডাল, মসলা, কেরোসিন, তামাক প্রভৃতি কিনে থাকে। পরিধানের বস্ত্রও তার থেকেই চালাতে হয়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উক্ত আর্থিক অবস্থা সমস্ত চাষীশ্রেণী সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। বস্তুত ৪·৫ একর চাষের জমি অল্পসংখ্যক চাষীরই আছে। সমানভাবে ভাগ করে দিলে ওই পরিমাণ জমি সকলেই পেতে পারে (ফ্লাড্ কমিশন)। প্রকৃত অবস্থা উল্লিখিত অবস্থার চেয়েও খারাপ। কারণ জমি অসমান ভাগে বিভক্ত। পরিবার-প্রতি কর্ষণাধীন জমির আয়তন জানবার উদ্দেশ্যে ফ্লাড্ কমিশন যে তথ্য সংগ্রহ করেন তা থেকে

অত্যন্ত বিস্ময়কর কতগুলি সত্য আবিষ্কৃত হয়। প্রায় সমস্ত জেলা থেকেই ওই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সেগুলি সমস্ত বাংলাদেশ সম্বন্ধে সত্য। নীচে কমিশনের প্রকাশিত তালিকাটি উদ্ধৃত করা হল।

জিলা	পরিবারের সংখ্যা	পরিবার প্রতি জমির গড় পরিমাণ (একর)	শতকরা যত পরিবারের এই জমি আছে					
			২ একরের কম	২-৩ একর	৩-৪ একর	৪-৫ একর	৫-১০ একর	১০ একরের বেশি
বাখরগঞ্জ	৮০৪	১·১৭	৬১·৮	১৩·১	৯·১	৩·৯	১০·৯	১·২
বাঁকুড়া	৬৭০	৮·১৭	৫৩·৭	৮·৯	৭·৮	৪·৫	১৪·৮	১০·৩
বীরভূম	৭২৭	৪·৬৪	১৫·১	১০·১	৭·৪	৮·৫	১৯.২	৮·২
বগুড়া	৪৬৪	৪·১৮	৩৪·৫	১৪·২	১৩·৬	১২·৭	১৭·৯	৭·১
বর্ধমান	৮০৩	৫·৬৩	২৮·৬	১০·৯	৮·৯	১০·৮	২৬·৬	১২·৮
চট্টগ্রাম	৬৯০	২·৪৫	৬০·৩	১০·১	৮·৮	৫·৮	১০·৭	৪·৩
ঢাকা	৫০৮	২·১০	৬২·৪	১১·৬	৬·১	৬·১	৫·১	৩·৫
দিনাজপুর	১০২০	৬·০৮	২৪·২	৮·৯	১১·১	১০·২	২৮·৩	১৫·০
ফরিদপুর	১১৫৪	১·৬৩	৮১·৫	৭·৬	৩·৪	১·৮	২·৬	০·৬
হুগলি	৫৯৫	৩·৭৪	৩২·৭	১৩·	১৩·	১০·৯	১৮·৮	১০·২
হাওড়া	৩৩৬	৩·৫৩	৫৩·২	১৪·৩	৫·১	৪·৫	১৭·৫	৫·৪
জলপাইগুড়ি	৫৩০	৮·৭৬	৫·৭	৬·০	১০·৯	১৬·৭	৩৩·২	২০·৪
যশোহর	১০৭৩	৪·৭৮	২৮·৫	১০·৩	৯·৬	৯·৮	২৭·১	১৩·৬
খুলনা	৩৫৬	৪·৭৮	৫৫·৬	৭·৮	৯·	৬·১	১৩·৯	৭·৬
মালদহ	৩০২	৩·০৪	৫৭·২	৭·৮	৮·৪	৬·৯	১৫·৯	৬·৮
মেদিনীপুর	১১১০	৪·২৩	৩৮·২	১৬·১	০·৯	১০·৫	১৭·৬	৬·৭
মুর্শিদাবাদ	১১৭৮	৪·৩০	৩৮·৩	১০·১	৯·৩	৭·৫	১৬·৯	৭·৭
ময়মনসিংহ	৯৩১	৩·৮৬	৩৪·১	১৩·৯	১১·৯	১০·৭	১৬·৯	৬·৫
নদীয়া	৮৭০	৪·৮৩	১৬·৮	৯·৬	০·৮	১০·১	২০·৩	১১·৮
নোয়াখালি	৫০২	২·৪১	৬৫·৩	১২·১	৭·৮	৩·৭	৪·২	১·৮
পাবনা	৭০১	১·৩৯	৬৪·১	৯·২	৫·৮	৪·১	৭·১	২·৪
রাজসাহী	১০১৮	৫·৫২	৩১·৮	৯·৩	৯·৭	৯·১	২৫·৫	১৪·৬
রংপুর	১১৯৩	৬·৬৭	২০·৬	১৫·৩	১৩·৪	১০·৬	২১·৪	১১·২
ত্রিপুরা	৯৫০	১·২২	৬৩·৯	১৩·৭	৮·৬	৭·৩	৬·৬	২·৯
চব্বিশপরগণা	১১৭৪	৪·৩৩	৫৬·৭	১০·৭	৮·৬	৪·৭	১০·৯	৭·২
মোট	১৯৫৯৯	৪·৩৬	৪৬·০	১১·২	৯·৪	৮·০	১৭·০	৮·৪

এই তালিকায় দেখা যায় যে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় জনপ্রতি চাষের জমির পরিমাণের অনেক তফাত আছে এবং সমস্ত বাংলাদেশের গড়পড়তা পরিবার-প্রতি জমির পরিমাণ হয় ৪·৩৬ একর। তফাতটা এইভাবে দেখা যাচ্ছে: ফরিদপুরে চাষের জমি যেখানে ১·৬৩ একর সেখানে জলপাইগুড়িতে দেখা যায় ৮·৭৬ একর। যে সমস্ত জেলায় লোকবসতি অত্যন্ত ঘন সেখানে চাষীদের জোতগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র। যেমন—বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালি, পাবনা ও ত্রিপুরা অঞ্চলের চাষীদের জোত গড়ে ২·৫ একরেরও কম। অন্যদিকে যে সমস্ত জেলায় লোকসংখ্যা কম ও বসতি বিরল সেসব জেলায়, যেমন—বাঁকুড়া, দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়িতে প্রত্যেক জোতের আয়তন গড়পড়তা আয়তনের (৪·৩৬) চেয়ে অনেক বেশি।

মোটের উপরে বাংলাদেশের সমস্ত চাষীদের মধ্যে শতকরা ৪৬ জনের চাষের জমি দেখতে পাওয়া যায় ২ একরের নীচে। এই ৪৬ জনের ভিতরেই শতকরা ২২·৫ ভাগের একেবারেই জমি নেই এবং বাকি ২৩·৫ ভাগের জোত ২ একরের বেশি নয়। অন্য ২০ ভাগের কিছু বেশি লোকের ২-৪ একর, শতকরা ৮ ভাগের ৪-৫ একর ও প্রায় ২৫ ভাগের ৫ একরেরও অধিক জমি আছে। ৪·৫ একরের জোত আছে এমন একটি পরিবারের আর্থিক অবস্থা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কৃষিজীবীগণের দুই-তৃতীয়াংশের অবস্থা তদপেক্ষা খারাপ। এই প্রসঙ্গে অনেক লেখক একটি পরিবার প্রতিপালনে উপযুক্ত কত পরিমাণ চাষের জমি প্রয়োজন তা স্থির করতে চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, এক-একটি জোত ৫ একর করে হলে একটি পরিবারের ভরণপোষণ তাতে চলে যায়। ফ্লাড্ কমিশন বলেন যে, তাঁদের মতে একটি পরিবারের উপযুক্ত খাদ্যবস্ত্র প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করতে অন্যূন ৫ একর চাষের জমির দরকার। যদি সেই জমিতে

আমন ধান ভিন্ন আর কিছুই না জন্মায় তবে জোত ৫ একর না হয়ে ৮ একর হওয়া প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, বাংলাদেশে ৩ কোটি ২০ লক্ষ একরের ফসলের মধ্যে ২ কোটি ৩০ লক্ষ একরের বেশি শুধু ধান। সার্ টমাস হলডারনেস বলেন যে, পরিমিত সিঞ্চনের ব্যবস্থা সম্ভব হলে ৫ একর জমির দ্বারাই একটি পরিবার স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারে। কিন্তু সার্ আজিজুল হক তাঁর সঙ্গে একমত নন। তাঁর মতে ৫ একর জমি প্রয়োজনের উপযুক্ত নয়।

অবনত কৃষি

বাংলার কৃষিপ্রথা অত্যন্ত প্রাচীন ও অনুন্নত। কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক উপায়ের সাহায্য যথোচিত লওয়া হয় না। অন্য দেশের ফসলের ফলনের সঙ্গে যদি বাংলার ফসল উৎপত্তির তুলনা করা যায় তাহলে বোঝা যায় যে বাংলাদেশের কৃষি কত পিছনে পড়ে আছে। এই দেশের প্রধান উৎপন্ন ফসল হচ্ছে ধান, পাট, গম, ছোলা, আখ, তামাক, তিসি প্রভৃতি। নীচে অন্যান্য দেশে এই শস্যগুলির ফলন দেখানো হল :

চাল ১৯৩৫ সালে প্রতি একরে ফলন (পাউণ্ড)		গম প্রতি একরে ফলন (পাউণ্ড)		তামাক প্রতি একরে ফলন (পাউণ্ড)	
বুলগেরিয়া	১৯০৪	কানাডা	১০৪৫	যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা)	৭৪৭
ঈজিপ্ট	৩১৭৯	যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা)	৮৬৯	বেলজিয়াম	২১৪৮
ফরমোজা	২২২০	ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	২১২৩	জার্মানি	২১২২
ইন্দোচীন	১০৩২	ডেন্মার্ক	২৭৯৭	জাপান	১৫৬৯
ইটালি	৪৭৪৩	হল্যাণ্ড	২৬৮৩	ভারতবর্ষ	১১৭৪
জাপান	২৯৮৮	জাপান	১৪১৭	বাংলাদেশ	৯৯২
জাভা	১৩২২	আর্জেন্টিনা	৭৫৬		
কোরিয়া	১৭৫৯	ভারতবর্ষ	৭১৮		
শ্যাম	১৩৯৮	বাংলাদেশ	৬০০		
স্পেন	৫৫৪২				
যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা)	২১৩৮				
ভারতবর্ষ	৮২৮				
বাংলাদেশ	৮৮৪				
Bengal Paddy and Rice Enquiry Committee's Report, 1940.		বাংলাদেশের ১৯৩১-৪০ সালের গড় ফলন। অন্যান্য হিসাবগুলি United States Year-book of Agriculture থেকে উদ্ধৃত।		বাংলাদেশের ফলন ফ্লাড কমিশনের রিপোর্ট থেকে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য হিসাব U.S. Year book of Agriculture থেকে উদ্ধৃত।	

আখ	
প্রতি একরে ফলন	(টন)
হাওয়াই	৬৪.৮
জাভা	৪৮.৩
যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা)	১৩.৬
কিউবা	১৪.০
মরিসস	১৮.৯
ফিলিপাইন	১৬.৮
ভারতবর্ষ	১২.৩
বাংলাদেশ	২০.০

Estimates of Area and Yield of Principal Crops in India, 1940-41. বাংলাদেশের হিসাব ফ্লাউড্ কমিশনের রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত।

তিসি	
প্রতি একরে ফলন (পাউণ্ড)	
আর্জেন্টিনা	৬০৪
নিউজিল্যাণ্ড	১১২০
ঈজিপ্ট	৭৩৯
ফ্রান্স	৫১৫
পোল্যাণ্ড	৪২৫
ভারতবর্ষ	২৮৩
বাংলাদেশ	৪০৮

Estimates of Area and Yield of Principal Crops in India 1940-41.

দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য অনেক দেশে বাংলাদেশের চেয়ে চালের ফলন বেশি। জাপানের ফলন বাংলার তিনগুণ, স্পেনে ছয়গুণ, যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিগুণেরও বেশি। এই সকল দেশে বিজ্ঞানের দ্বারাই ফলনের বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। গমও ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ডেন্মার্ক, এমন কি জাপানেও বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি ফলে। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও আর্জেন্টিনায় গমের ফলন বাংলাদেশ অপেক্ষ বেশি হলেও অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি নয়, কারণ এই সব দেশে চাষ সুবিস্তৃতভাবে হয়। পাট একমাত্র বাংলাদেশে জন্মায় বলে তুলনা করা সম্ভব নয়। ইদানীং

আখের চাষের অনেক উন্নতি হয়েছে সত্য, কিন্তু এখনও জাভা ও হাওয়াই থেকে অনেক পিছিয়ে আছে।

ভারতের অন্য প্রদেশগুলির সঙ্গেও তুলনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ফসল উৎপত্তির পরিমাণ তাদের অনেকের চেয়ে কম। বাংলাদেশে ১৯৩১ থেকে ১৯৪০ সাল এই দশ বৎসরে গড়ে প্রতি-একরে ৮৬৬ পাউণ্ড চাল হয়। সেস্থলে মাদ্রাজে হয়েছে ১১৩৮ পাউণ্ড, কুর্গপ্রদেশে ১৪৭৬ পাউণ্ড ও বোম্বাইয়ে ৯৪০ পাউণ্ড। গমের ফলন হয় বাংলায় ৬০০ পাউণ্ড, বিহারে ৮৫৮, যুক্তপ্রদেশে ৭৬৭, পাঞ্জাবে ৭৫৮ ও সিন্ধুদেশে ৬২২ পাউণ্ড। আখের চাষেও খুব বেশি তফাত দেখা যায়। বোম্বাইপ্রদেশের গুড় উৎপন্ন হয় প্রতিএকরে ৫৬৯৬ পাউণ্ড, মাদ্রাজে ৬৩৯৮, বরোদায় ৫০৪০ ও বাংলাদেশে ৩৭১২ পাউণ্ড।

একথা অবশ্য বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন প্রকারের জমি ও জলবায়ুর জন্য একই প্রথায় চাষ হলেও ফলনের তারতম্য হয়। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলাদেশে অনেক উন্নতির অবকাশ আছে এবং এখনও অনেক গুণে ফলন বাড়ানো সম্ভব।

কৃষির কাজে কী পরিমাণ যন্ত্রের প্রয়োগ হচ্ছে তা দেখেও বিচার করা যায় যে কৃষি কতদূর উন্নতি লাভ করেছে। এদেশের চাষীরা অতি পুরানো যুগের কয়েকটি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। এক জোড়া গোরু, একটি কাঠের লাঙল, মই, গুটি দুই কোদাল, দুই-তিনটি নিড়ানি ও কয়েকটি কাস্তে এই হল তাদের মোট যন্ত্র-উপকরণ। বলা বাহুল্য যে সামান্য এই কয়টি যন্ত্রের সাহায্যে উপযুক্তভাবে চাষের কাজ সম্পন্ন হতে পারে না এবং যথোচিত ফললাভ করা যায় না। ১৯৪০ সালে গো-মহিষাদি ও যন্ত্রপাতির সংখ্যা গণনায় দেখা যায় যে, ওই বৎসরে ৪৩, ৩০, ৮০৪টি কাঠের লাঙল, ৬, ৩০৪টি লোহার লাঙল, ৮, ২১, ৯১৪টি গোরুর গাড়ি, গোরুর দ্বারা চালিত আখমাড়াই কল ১৭, ৬৭০টি ও বিদ্যুৎ-

চালিত ১২৮টি আখমাড়াই কল ব্যবহৃত হয়। জলসেচনের জন্য ১২৮টি ইঞ্জিন, নলকূপ-সংলগ্ন ৫৫টি বিদ্যুৎ-চালিত পাম্প এবং চাষের জন্য ৫২টি ট্র্যাক্টারের ব্যবহার দেখা যায়। মোট কর্ষণাধীন ২ কোটি ৮ লক্ষ একর জমিতে উক্ত যন্ত্রগুলি কাজে লাগানো হয়েছিল। কৃষিবিজ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ তুইটি দেশ রাশিয়া ও আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করে বিষয়টি বিচার করে দেখা যাক। আমেরিকায় ৪১ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমি চাষের কাজে ১০ লক্ষ ট্র্যাক্টর, ৪৫,০০০ কম্বাইন (ট্র্যাক্টর-চালিত শস্য কাটবার ও ঝাড়বার কল) ৮০০,০০০ মালবাহী মোটরগাড়ি ব্যবহার হয়। এ ছাড়া লাঙল, বীজবপন-যন্ত্র, নিড়ানি প্রভৃতি ট্র্যাক্টার-সংলগ্ন যন্ত্রপাতিও পূর্ণমাত্রায় আছে। সোভিয়েট রাশিয়াতে দেখা যায় যে কর্ষণাধীন জমি মোট ৭০ কোটি একর। ১৯৩৮ সালে ট্র্যাক্টারের সংখ্যা ছিল ৪৮৩, ৫০০ ও ১৫৩, ৫০০টি কম্বাইন ছিল। সেই অনুপাতে লাঙল, বপন-যন্ত্র ইত্যাদি আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিও যথেষ্ট ছিল। কৃষিকার্যে এই ব্যাপক যন্ত্রপ্রয়োগের ফলে চাষীদের কতটা লাভ হয়েছে দেখা যাক। বাংলাদেশে একটি চাষী এক জোড়া গোরু ও একটি লাঙলের সাহায্যে দিনে ১ বিঘার বেশি জমি চাষ করতে পারে না। সেই স্থলে আমেরিকায় একজন চাষী একটি ট্র্যাক্টারের সাহায্যে দিনে ২০ একর জমি চাষ করে। সেই ট্র্যাক্টার-সংলগ্ন বপন-যন্ত্রের সাহায্যে সে ৭০-৮০ একর পর্যন্ত জমিতে বীজ বুনতে পারে। সেস্থলে শুধু বীজ ছিটানোর কাজ বাংলার চাষী কেবল ৪-৫ একর পারে। ফসল কাটার সময় তুজন লোক একটি কম্বাইনের দ্বারা এক দিনে ৩০-৫০ একর জমির উৎপন্ন গম কাটা ও ছাঁটার কাজ সম্পন্ন করতে পারে। সেই পরিমাণ কাজের জন্য বাংলাদেশে প্রয়োজন হয় ৩০০-৫০০ লোকের। বলা বাহুল্য যে, যন্ত্রের দ্বারা চাষ হলে সাধারণভাবে চাষের চেয়ে অনেক বেশি ফললাভ হয়।

বাংলাদেশের জমিতে উন্নতপ্রণালীর চাষের যন্ত্রের প্রয়োগ না হওয়ার

কারণ এই যে, চাষের জমি অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। দ্বিতীয়ত জোত শুধু আয়তনে ক্ষুদ্র নয় উপরন্তু জোতের জমিগুলি অসম্বদ্ধভাবে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে। একই জোতের জমিগুলির মধ্যে কখনো দুই তিন মাইলেরও ব্যবধান দেখা যায়। এই কারণে এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে যাওয়া-আসায় অযথা সময় ক্ষয় হয়। ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের সীমা নির্দেশ করার জন্য তার চারদিকে আল দেওয়া হয়, তাতে অনেকখানি জমি নষ্ট হয়। সার বহন করা ও ফসল সংগ্রহের কাজে অনেক বাধা ও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। মালিকের পক্ষে সমগ্র জোতের কাজ দেখাশোনা করা কঠিন হয় এবং সে কারণে অনেক চাষীকে নিজের জমি কিছু পরিমাণে ভাগ-বন্দোবস্ত করে দিতে দেখা যায়। অনেক প্রকার শস্যের জন্য খেতের চারিদিকে বেড়া দেওয়া দরকার হয় কিন্তু অত্যধিক অসম্বদ্ধতার দরুন তা সম্ভব হয় না। অবশেষে জমির স্থায়ী উন্নতি করার উদ্দেশ্যে নলকূপ বসানো, সিঞ্চন ও জলনিকাশের ব্যবস্থা সুচারুরূপে করা সম্ভব হয় না। জমি একত্রিত হলে চাষ করা সহজ হয়। যন্ত্রের জন্য ও কৃষির স্থায়ী উন্নতি বিধানের জন্য ক্ষুদ্র জমিগুলিকে সংবদ্ধ করে একটি খণ্ডে পরিণত করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে, বিশেষ করে পশ্চিম-বঙ্গে, জলসেচন চাষের একটি প্রধান ও অতিপ্রয়োজনীয় কাজ। কিন্তু সেই কাজের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থার অভাব দেখা যায়। বহু যোজন বিস্তৃত জমিতে যেখানে বৎসরে দুটি ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব, সেখানে জলের অভাবে ফসল মাত্র একবার হয় এবং সে ফসলেও যেটুকু জলের প্রয়োজন তার জন্য নির্ভর করতে হয় একমাত্র মৌসুমী বর্ষার উপর। জলসেচনের উপযুক্ত ব্যবস্থা হলে বাংলার এই শুষ্ক প্রদেশেও কতকগুলি অর্থকরী ফসল যেমন আখ, তামাক ও তুলা অনেক পরিমাণে উৎপন্ন হতে পারে। বাংলাদেশে ১৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হয়। এর দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ বীরভূম,

বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের শুষ্কভূমি। অন্য অংশগুলি মালদহ, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া ও হুগলি জেলায়। মোট সিঞ্চিত ভূমির মধ্যে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার একর সরকারী ও ২ লক্ষ ৩৭ হাজার বেসরকারী কাটা খালের সাহায্যে সিঞ্চিত হয়। ৪৪ হাজার একর কুয়োর দ্বারা, প্রায় ৯ লক্ষ একর পুকুর এবং বাকি প্রায় ৫ লক্ষ অন্যান্য উপায়ে সিঞ্চিত হয়। সরকারী বা বেসরকারী কাটা খালের সাহায্যে যে জমি সিঞ্চিত করা হয় তার আয়তন বেশি নয়। সিঞ্চনের প্রধান সংস্থান দেখা যায় পুকুর। কিন্তু এর মধ্যে অনেকগুলি কাজের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। বীরভূম জেলার জরিপ-অফিসার ১৯১৪ সালে তাঁর জরিপ-রিপোর্টে লিখেছেন, "গ্রামের জমিদারগণ প্রায় স্বগ্রামে বাস করেন না এবং তাঁদের অবহেলার দরুন ও জনসাধারণের শৈথিল্যে জলসেচনের পুকুরগুলি ভরাট হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে। কতকগুলি পুকুরের জল শুকাইয়া এমন ভাবে ভরাট হইয়া গিয়াছে যে সেখানে চাষের দ্বারা বিবিধ প্রকারের শাক প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে।" এ ৩০ বৎসর আগের কথা। তারপরে অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। অতি-সম্প্রতি ১৯৩৯ সালের পুষ্করিণী-উন্নতি-বিধায়ক আইনের ফলে সরকার জলসেচের পুকুরগুলিকে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছুই করা হয়নি। বড়ো বড়ো খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং সে উপায়ে ফসলের উন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা আছে। একদিকে শুষ্কভূমিতে যেমন সিঞ্চনের প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে জলাভূমি থেকে জলনিকাশের ব্যবস্থা তেমনি প্রয়োজনীয়। জলনিকাশের ব্যবস্থার অভাবে বাংলাদেশের অনেক জমি অব্যবহার্য অবস্থায় পড়ে আছে।

বাংলার দরিদ্র চাষী যে জমি চাষ করে তা খুব উর্বর নয়। জমির উর্বরাশক্তি ক্রমেই কমে আসছে কি না সে বিষয়ে অনেক বিতর্ক ও

আলোচনা হয়েছে। এ সম্বন্ধে রয়েল কমিশন অব এগ্রিকালচার অনুসন্ধান নিয়ে বলেছেন যে, ভারতের কর্ষণাধীন ভূমির অত্যধিক ভাগ এমন অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে যে বর্তমান কৃষিপ্রথায় সে অবস্থায় আর কোনো অবনতি ঘটতে পারে না। ভারত সরকারের কৃষিসদস্য এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, "ভারতের কর্ষণাধীন ভূমির অধিকাংশ শত শত বৎসর ধরে চাষ হয়ে আসছে, এবং অনেক কাল থেকেই তা অনুর্বরতার শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছে।" জমির প্রজননশক্তি যে অত্যন্ত কম এবং বস্তুত সে শক্তি যে শেষসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে তার সমর্থন উক্ত দুই মতেই পাওয়া যাচ্ছে।

এই অনুর্বরতা রোধ করার জন্য জমিতে প্রচুর সার দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টার অভাব দেখা যায়। সার সংযোগের উপকারিতা সম্বন্ধে চাষীরা যে একেবারে অজ্ঞ তা নয়। আসলে তারা এত দরিদ্র যে উপযুক্ত সার কিনে জমিতে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। গোবর সারই প্রধানত সকলে ব্যবহার করে থাকে। ফসলের সার হিসাবে গোবর মূল্যবান, কিন্তু তার অনেক ভাগ ঘুঁটে প্রভৃতি জ্বালানির কাজে নষ্ট করা হয়। খৈল সার আলু, তামাক, আখ প্রভৃতি ফসলের পক্ষে উপযুক্ত। যে চাষীরা অর্থব্যয় করতে সমর্থ হয় তারা উক্ত ফসলগুলির জন্য এই সার ব্যবহার করে। হাড়ের গুঁড়া বিশেষ করে এদেশের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সার। চাষের জমিতে যে ফস্‌ফেটের প্রয়োজন হয় তা এ থেকে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এদেশ থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে ওই হাড় বিদেশে চালান হয়ে যায়।

একথা অনেকেই বলেন যে, আমাদের চাষীরা অশিক্ষিত, কোনো কাজে তাদের উৎসাহ নেই এবং সেজন্য তারা এত দুর্দশাগ্রস্ত। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে তাদের অবনত কৃষির মূল অশিক্ষা নয়।

তারা অত্যন্ত দরিদ্র এবং অর্থাভাবে সার, ভালো জাতের বীজ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কৃষির উপকরণগুলি কিনতে সমর্থ হয় না। জলসেচনের জন্য পুকুর কাটা কিংবা জলনিকাশের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা চাষীর সামর্থ্যের বাইরে। এই কারণেই কৃষির উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়গুলি চাষীদের কাছে অর্থহীন। ফসলে রোগ হলে মাঠভরা ফসল তাতে নষ্ট হয়ে যায়, রোগের ওষুধ ও তার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি চাষীরা কিনতে পারে না। শস্যখাদক পতঙ্গের আক্রমণে যখন সমস্ত শস্য বিনষ্ট হবার উপক্রম হয় তখন সেই ফসল রক্ষা করার জন্য তাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হয় না, তারা নিতান্ত অসহায়, সেই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাদের নেই। একমাত্র এই কারণে সরকারী কৃষিবিভাগ চাষীদের উন্নত প্রণালীর কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদানে সফলকাম হতে পারেননি। চাষীদের পক্ষ থেকে সে শিক্ষার প্রতি যে অনুরাগ দেখা যায় না তার কারণ এই নয় যে, তারা স্বভাবত শিক্ষার প্রতি বিমুখ। যে দারিদ্র্যের মধ্যে তারা কৃষিকাজ করতে বাধ্য হয় তাতে শিক্ষা বা বৈজ্ঞানিক উন্নতির কথা তারা চিন্তা করতে পারে না।

চাষীর ঋণ

এদেশের চাষীশ্রেণী অত্যধিক ঋণগ্রস্ত। সঠিক হিসাব জানা দুষ্কর হলেও চাষীদের ঋণের ব্যাপারে সময়ে সময়ে যে তদন্ত করা হয়েছে, তাতে অতি শোচনীয় অবস্থা প্রকাশ পায়।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারি কমিটির তদন্তে দেখা যায় যে, ১৯২৯ সালে সমস্ত বাংলাদেশের কৃষিজীবীর ঋন ছিল ১০০ কোটি টাকা, গড়ে মাথাপিছু সে ঋণ হয়.১৬০৲ টাকা। এই ঋণের দায়ে চাষীরা কি ভাবে আক্রান্ত হয়ে আছে তা আলোচনা করে দেখা যাক। এই কমিটির হিসাবে সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হয়েছিল ২৪৩·৮ কোটি টাকা।

কিন্তু এর কিছুকাল পরেই সাধারণ আর্থিক মন্দার ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য কমে প্রায় অর্ধেক হয়। ১৯৩০-৪২ পর্যন্ত এই ১২ বৎসর চাষীদের পক্ষে দুঃসময় গিয়েছে। ফ্লাড্ কমিশন সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য পরে হিসাব করেন ১৪৩ কোটি টাকা। চাষীরা যে অসাধারণ ঋণভারগ্রস্ত তা বোঝা যায় যখন দেখতে পাই যে আয় যেখানে বৎসরে ১৪৩ কোটি টাকা মাত্র সেখানে ১০০ কোটি টাকার উপর সুদ ও আসলের কিয়দংশ শোধ করতে হয়। যদি শতকরা ২০ টাকা হারে সুদ হয় তাহলে শুধু সুদের পরিমাণ হয় বৎসরে ২০ কোটি টাকা, আসলের অংশ যুক্ত হলে এর পরিমাণ আরো বেশি হবে। যদি ধরা যায় যে ১২ বৎসরের মধ্যে চাষীরা সমস্ত ঋণ শোধ করে তবে আসলের জন্য বৎসরে ৮ কোটি টাকার অধিক দিতে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ১৪৩ কোটি টাকা আয় থেকে ২৮ কোটি টাকা চাষীদের ঋণশোধে ব্যয় করতে হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯২৯ সালে ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি যে তদন্ত করেছিলেন তার অল্পকাল পরেই আর্থিক মন্দা শুরু হয়। ফলে চাষীদের আর্থিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটে এবং স্বভাবত ঋণের মাত্রা বেড়ে যায়। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মত এই যে, আর্থিক মন্দার প্রারম্ভ থেকে যুদ্ধের আগে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চাষীদের ঋণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়েছে।

বেঙ্গল বোর্ড অব ইকনমিক এন্‌কোয়ারি ফরিদপুর জেলার গ্রামবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করেন তা থেকে দেখা যায় যে সেখানে ১৯২৮ সালে গড়ে প্রত্যেক পরিবারের ঋণ ছিল ১৪৬৲ টাকা ও আয় ছিল ২০৭৲ টাকা। ১৯৩৩ সালে সেই ঋণ বেড়ে গিয়ে ২১৭৲ টাকা হয় ও আয়ও সেই সঙ্গে কমে গিয়ে ১০৫৲ টাকায় দাঁড়ায়। চাষীদের ঋণ যে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নীচের অঙ্কগুলি থেকে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে। মেজর জ্যাক্ ১৯০৬-১০ সালে

ফরিদপুর জেলায় একটি তদন্ত করেন। সেই জেলাতেই তৎকালীন জেলা হাকিম বারোজ সাহেব ১৯২৯ সালে ও বেঙ্গল বোর্ড অব ইকনমিক এন্‌কোয়ারি ১৯৩৩ সালে একই বিষয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এই সব তদন্তের ফলাফল উদ্ধৃত করা হল :

	বোর্ড অব ইকনমিক এনকোয়ারি (স্থায়ী-স্বত্ববিশিষ্ট কৃষক) ১৯৩৩	বারোজ সাহেবের তদন্ত ১৯২৯	মেজর জ্যাকের তদন্ত ১৯০৬-১০
পরিবার-প্রতি গড় ঋণ টাকা)	২১৭	১২৮	৫৫
ঋণগ্রস্ত পরিবার-প্রতি গড় ঋণ (টাকা)	২৬২	২০৩	১২১
ঋণমুক্ত পরিবারের শতকরা হার	১৭·০	৩৭·০	৫৫

১৯০৬-১০ সালের মধ্যে গড় ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৫৲ টাকা। কিন্তু তা বৃদ্ধি পেয়ে মন্দা শুরু হবার ঠিক আগে হয় ১২৮৲ টাকা এবং পরে আরো অনেক বেড়ে যায়। উল্লিখিত কেবল ঋণগ্রস্ত পরিবারের ঋণও একই ভাবে বেড়েছে। শুধু ঋণের মাত্রাই যে বেড়েছে তা নয়, ঋণমুক্ত পরিবারের সংখ্যার শতকরা হারও কমে গিয়েছে। জ্যাকের সময়ে অর্ধেকের বেশি পরিবার ঋণমুক্ত ছিল, কিন্তু ১৯২৯ সালে ঋণমুক্ত দেখা যায় শতকরা ৩৭টি ও ১৯৩৩সালে মাত্র ১৭টি। বাংলাদেশের সর্বত্রই এই অবস্থা, চাষীশ্রেণী দিনে দিনে যে অভাবনীয় দুরবস্থায় পতিত হচ্ছে তার পরিচয় এ থেকে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, চাষীরা কিসের জন্য এত টাকা ধার করে। এর সহজ উত্তর এই যে তারা এত দরিদ্র যে ঋণ করতে তারা বাধ্য হয়। যে

যে বছরে ফসল ভালো হয়, সে বছরে তারা প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কিনতে হয়তো সমর্থ হয় কিন্তু মোটের উপর দুর্বৎসরই বেশি আসে। খরা কিংবা অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। রোগ হয়ে হালের গোরু মরে গেলে নতুন গোরু কিনবার প্রয়োজন হয়। সময়মত খাজনা দিতে হয় এবং নিজের থাকবার সামান্য কুঁড়ে ঘরটিকেও সময়ে সময়ে মেরামত করতে হয়। খাবার চাল ঘরে যখন থাকে না তখন চাষী যায় মহাজনের কাছে, তার কাছ থেকে ধারে ধান এনে খাওয়ার সমস্যা সমাধান করে। শস্য রোপণের সময় বীজের দরকার হয়, তা না হলে পরবর্তী ফসল পাওয়া যাবে না, অসুস্থ হয়ে পড়লে নগদ পয়সা দিয়ে মজুর রেখে কাজ করাতে হয়। এই সব নানা কারণে অভাবগ্রস্ত হয়ে চাষীরা ঋণ করতে বাধ্য হয়।

কোনো কোনো লেখক এই অস্বাভাবিক ঋণের জন্য চাষীদের দায়ী করেন। তাঁরা বলেন যে সামাজিক ও ধর্ম-অনুষ্ঠানে, যেমন—বিবাহ ও শ্রাদ্ধে অত্যধিক ব্যয়, সাধারণ অমিতব্যয়িতা ও মামলা-মকদ্দমাপ্রিয়তা চাষীদের ঋণগ্রস্ত হবার কারন, কিন্তু আধুনিক লেখকগণ এই মত পোষণ করেন না। ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারি কমিটি গ্রামের অবস্থা বিশেষভাবে অনুসন্ধান নিয়ে দেখেছেন যে, উক্ত মত ভিত্তিহীন। বগুড়া জেলায় করিমপুর গ্রামে যে সমস্ত ঋণগ্রস্ত পরিবার আছে তাদের ঋণসম্বন্ধে অনুসন্ধান করে এই কমিটি জেনেছেন যে, কি-কি কারণে তারা ঋণগ্রহণ করে। নীচে তার যথাযথ উল্লেখ করা হল :

	টাকা
পূর্বঋণ পরিশোধ	৩৮৯
কৃষির স্থায়ী উন্নতি ও গো-মহিষাদি ক্রয়ের জন্য	১,০৮৭
খাজনা	৫৭৩
চাষ	৪৩৫
সামাজিক ও ধর্ম-অনুষ্ঠান	১৫০
মামলা-মকদ্দমা	১৫
অন্যান্য	৬৬
	মোট ২,৭১৫

ঋণ বৃদ্ধি পাবার প্রধান কারণ হচ্ছে মহাজনের অত্যধিক সুদের হার। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারি কমিটি তদন্ত করেন, সে সময়ে সুদের হার ছিল অত্যন্ত বেশি। পাবনা জেলায় ছিল শতকরা ৩৭॥০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত ও ময়মনসিংহে ২৪ থেকে ২২৫ টাকা। এমন কি আদালতেও সেই সময় সুদ শতকরা ৭৫ থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত ডিক্রী হয়েছে। বীরভূম জেলাতেও অনুরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই জেলার ৬টি গ্রামে যে ঋণের তদন্ত করা হয় তাতে দেখা গিয়েছে যে, মোট ৪২৬টি পরিবারের মধ্যে ২৩৪টি পরিবার ঋণগ্রস্ত এবং তাদের ঋণের পরিমাণ ছিল মোট ৫৩,৭৯৯ টাকা। ওই মোট ঋণের ৯,০৮১ টাকার সুদের হার ছিল শতকরা ১২॥০ টাকার কম, ১০,০৪১ টাকার সুদ ছিল শতকরা ১২॥০-১৮৸০ টাকার মধ্যে ; ২৮,৫১৩ টাকার শতকরা ১৮৸০-৩৭॥০ টাকা ; ২,৮৮৭ টাকার শতকরা হার ৩৭॥০-৭৫ টাকা ; ৬৬৭ টাকার শতকরা ৭৫-১৫০ টাকা এবং ১,১১০ টাকার সুদ ছিল ১৫০ টাকারও উপরে। মাত্র ১,৫০০ হাজার টাকা বিনা সুদে ধার দেওয়া হয়েছিল।

ঋণবৃদ্ধির সঙ্গে চাষীদের আর্থিক অসংগতি ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠল।

এ বিষয়ে চাষীদের সাহায্য করা কর্তব্য মনে করে সরকারের পক্ষ থেকে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করা হয়। সমিতিগুলি সরকারের সাহায্যে এবং তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে চালিত হয়। ১৯৪১ সালের জুন মাসে ৩৫,২৬১টি ঋণদান-সমিতি ছিল এবং তাদের সভ্যসংখ্যা ছিল ৭,৭৪,২০৫। সে বছর ৪৭ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হয়। চাষীদের সমগ্র ঋণের মধ্যে ৩,৬২,৭৭,৯৯৯ টাকা ঋণদান সমিতির প্রাপ্য। এই টাকা সমগ্র ঋণের ৩০ ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা কিছু বেশি। সমবায় ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ১২॥০ টাকা, অবশ্য ব্যাঙ্কবিশেষে এই হারের তারতম্য হয়। এই ব্যাঙ্কগুলি থেকে খুব সহজে টাকা ধার করা যায় না, সেইজন্য গ্রামের মহাজনই এখন পর্যন্ত ঋণগ্রহণের প্রধান আশ্রয় হয়ে আছে। ঋণদান-সমিতিগুলি মহাজনের স্থান গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি। বাংলাদেশে ৫টি জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে যাদের কাজ হচ্ছে চাষীদের দীর্ঘ মেয়াদের ঋণদান করা। এ পর্যন্ত এই ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণদান করেছে তার পরিমাণ অতি অল্প।

১৯৩৩ সালে বাংলায় মহাজন-আইন পাস হয়। এই আইন অনুযায়ী মহাজনেরা আসলের যে পরিমাণ হয় তার অধিক সুদ কখনো দাবি করতে পারে না। এই সঙ্গে সুদের হারও অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়। আইনটি করার পিছনে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে সেই আইনের যথোচিত ফল হয়নি। অসদুপায়ে মহাজনেরা আইন এড়াতে লাগল। অভাবে পড়ে চাষীরাও মহাজনের দাবি স্বীকার করে নেয়। সাধারণত মহাজনেরা যত টাকা ধার দেয় তার অনেক বেশি তমসুকে লিখে নেয় এবং এই ভাবে তারা আইনের হাত এড়িয়ে নিজের ব্যবসা বজায় রাখে।

সুতরাং অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল না এবং ১৯৩৬ সালে বাংলা চাষীখাতক- আইন পাস হল। এই আইনের ফলে সমস্ত প্রদেশে

অনেকগুলি ঋণসালিশী বোর্ডের সৃষ্টি হয়। সরকার এই বোর্ডগুলি গঠন করেন এবং আপসে ঋণের মীমাংসা করা এই বোর্ডের কাজ। খাতকের ঋণ কিস্তিবন্দি করে দেওয়া হয়, এতে চাষীরা ১০,১৫ এমন কি ২০ বছরেও ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ পায়। শুধু তাই নয় মূল দাবির অনেক কমে ঋণ শোধ করা সম্ভব হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোট দাবির শতকরা ৫০ ভাগ দিয়েই সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করা হয়। এর ফলে কর্জের টাকা আর বাড়তে পারে না।

এ কথা অবশ্য ঠিক যে উক্ত দুটি আইনের ফলে চাষীদের ঋণের ভার অনেকাংশে লাঘব হয়েছে ও মহাজনের পক্ষে পূর্বের মতো নির্বিবাদে চাষীর কাছ থেকে উচ্চ হারে সুদ আদায় করা সম্ভব হয় না এবং বর্তমানে মহাজনী ব্যবসায়ে সরকারী অনুমোদন-পত্রের প্রয়োজন হয়। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ৪,১৬০ জন মহাজন এই অনুমোদন-পত্র পায়। এই সকল কারণে মহাজনেরা পূর্বের মতো তেজারতি ব্যবসায়ে লাভবান হয় না এবং স্বভাবতই তারা ঋণদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তার ফলে চাষীদের পক্ষে টাকা কর্জ পাওয়া কঠিন হয়েছে।

ঋণ সমস্যা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যা কিছু করা হয়েছে তাতে চাষীদের উপকার হলেও তাতে মূল সমস্যার সমাধান হয়নি। সে ভাবে চাষীদের পুরানো ঋণ পরিশোধের উপায় হয়েছে সত্য কিন্তু তাদের যে আবার নূতন করে ঋণ গ্রহণ করতে হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়। প্রকৃতপক্ষে যে কারণে চাষী একবার ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল, সেই কারণগুলি সমানই থেকে যাচ্ছে। তার আর্থিক অভাব দূর করা সম্ভব না হলে মহাজনের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান হবে না।

ভূস্বত্ব

এদেশের ভূমিসংক্রান্ত নিয়মকানুন অত্যন্ত জটিল। জমির স্বত্বাধিকারী জমিদার। লর্ড কনওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেশনের দ্বারা জমিদারদের জমির অধিকারী সাব্যস্ত করেন। জমি হস্তান্তর বা বিক্রয় করার ক্ষমতা তাঁদের দেওয়া হয় এবং উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁরা জমি ভোগ করতে পারবেন। জমিদারেরা সরকারকে রাজস্ব দেবেন এবং এই রাজস্বের পরিমাণ চিরকালের জন্য স্থির হয়। এইজন্য এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলা হয়। ১৭৯৩ সালের রেগুলেশনে জমিদার ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্ক তা নির্দিষ্ট আছে কিন্তু প্রজাদের স্বত্ব সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার আগে পর্যন্ত যারা জমিতে ফসল উৎপন্ন করে তাদেরই অধীনে জমি ছিল। কিন্তু কলমের এক আঁচড়ে সমস্ত ব্যবস্থা উলটে দিয়ে সব স্বত্ব জমিদারদের দান করা হয়। পূর্বকালে রাজারাও জমির মালিক ছিলেন না, তাঁরা উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ মাত্র দাবি করতে পারতেন। হিন্দুরাজত্বের সময় রাজাদের দাবি ছিল সাধারণত ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ এবং আকবরের সময় তা দেখা যায় এক-তৃতীয়াংশ। ইংলণ্ডের প্রথাঅনুসারে জমির মালিক landlord জমির উন্নতির জন্য দায়ী থাকেন। চাষের কাজের জন্য ঘরবাড়ি, জলনিকাশের ব্যবস্থা প্রভৃতির ভার জমির মালিক গ্রহণ করেন এবং তার পরিবর্তে প্রজারা (tenant) তাঁকে খাজনা দেয়। সম্ভবত এই আদর্শ মনে রেখে লর্ড কনওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। কিন্তু তার ফলে কী অনর্থপাত হয়েছে তা ক্রমে দেখা যাবে। জমিদারদের রাজস্ব ধরা হয় ৩ কোটি টাকার কিছু উপরে। রাজস্ব বাবদ যত টাকা দিতে হয় তার $\frac{১}{১০}$ পরিমাণ টাকা নিজে খাজনা আদায়ের পারিশ্রমিক হিসাবে জমিদার গ্রহণ করবেন এবং পূর্বপ্রচলিত পরগণা হারে খাজনা আদায় করা হবে এই স্থির হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় দেশে লোকবসতি বিরল ছিল এবং দেশের একটি অংশে শুধু চাষ-আবাদ হত। সে সময়ে লর্ড কর্নওয়ালিসের মতে সমস্ত প্রদেশের ১/৩ ভাগ, কোলব্রুকের মতে ১/৩ এবং গ্র্যাণ্টের মতে ৪/৫ ভাগ ভূমি অনাবাদি ছিল। ক্রমে লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল ও অনাবাদি জমিগুলি ক্রমে চাষ হতে লাগল। জমিদারগণ অনতিবিলম্বে নূতন জমি থেকে খাজনা আদায় শুরু করলেন এবং পূর্ব জমির খাজনা বাড়িয়ে দিলেন। এইভাবে প্রায় দেড়শত বৎসর গত হয়েছে এবং বর্তমানে রায়তরা জমিদারকে যত খাজনা দেয় তা হিসাব করে দেখা গিয়েছে মোট ১৭ কোটি টাকা। ১৯৩৭ সালে বাংলা পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে কোনো কোনো সদস্য মোট খাজনার পরিমাণ ২৬-৩০ কোটি পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। ওই মোট খাজনার অনেক ভাগ বেআইনীভাবে আদায় করা হয়। সেই খাজনা থেকে রাজস্ব বাবদ সরকারের প্রাপ্য মিটিয়ে বাকি অংশ জমিদার নিজে ভোগ করেন। চাষীরা কায়ক্লেশে কৃষি থেকে যে কিঞ্চিৎ উপার্জন করে প্রত্যেকের কাছ থেকে সে টাকার কিয়দংশ আদায় করেই জমিদারদের এত আয় হয়। যদি মোট কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৪৩ কোটি টাকা ধরা যায় তবে দেখা যাচ্ছে যে সেই পরিমাণের একটি বড়ো অংশ ১৪ কোটি জমিদারেরা গ্রহণ করেন। কিন্তু এর প্রতিদানে জমিদারের কাছ থেকে প্রজারা কিছুই পায় না। খাজনা আদায় করা ভিন্ন প্রজাদের কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক যদিও তাদের উপার্জিত অর্থের উপর জমিদারের আপন ঐশ্বর্য নির্ভর করে। যে জমির খাজনা আদায় করা তাঁদের কাজ তার সঙ্গে জমিদারের কোনো যোগ নেই, এমন কি জমিদারিতে বাস করাও তাঁরা পছন্দ করেন না। তাঁরা বাস করেন দূরে শহরে এবং শুধু খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে কখনো কখনো গ্রামে আসেন। সে কাজের ভার থাকে নায়েব-গোমস্তার উপরে, প্রজাদের সঙ্গে আদান-প্রদানে

যাদের অসততা, কূটকৌশল ও হৃদয়হীনতা বিশ্ববিখ্যাত। জমিদারের কাছ থেকে এরা যে বেতন পায় তা অতি সামান্য এবং গরিব অসহায় [illegible] কাছ থেকে [illegible] ইত্যাদির দ্বারা যে কোনো উপায়ে পারিশ্রমিক পূর্ণভাবে আদায় করে নেয়। নিরক্ষর চাষীরা জমিদারের সম্পূর্ণ মুঠার মধ্যে, জমিদারকে ডিঙিয়ে আইনের সাহায্য নেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। বেআইনীভাবে যে অতিরিক্ত খাজনা চাষীদের কাছ থেকে আদায় করা হয় তার নাম আবওয়াব এবং দেখা যায় যে সর্বত্রই চাষীরা জমিদারকে এই আবওয়াব দিয়ে থাকে। টাকা-প্রতি ।০-॥০ আনা হারে এই আবওয়াব আদায় করা হয়। আসল খাজনা আদায়ের কালে এই আবওয়াব তহুরি, মামুলি, পার্বনি, ডাকখরচা, টোলখরচা, তহশীলানা এবং দাখিলা খরচা প্রভৃতি নামে আদায় হয়ে থাকে। আরো অনেক রকমের আবওয়াব চাষীরা দেয় এবং কালে আবওয়াব ও আসল খাজনা প্রায়ই যুক্তভাবে আদায় হচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়। খাজনার পরিমাণ বাড়াবার প্রথা বরাবরই চলে আসছে এবং ১৯২১-৩০ সাল এই দশ বৎসরে খাজনা বৃদ্ধির দরুন আদালতে যতগুলি মকদ্দমা হয়েছে তার সংখ্যা ছিল মোট ২০০,১০৪। ১৯২১ সালে সংখ্যা ছিল ১০,৩৬৩; ১৯২৬ সালে তার চেয়ে বেশি দেখা যায়। সে বছরে ১৬৮৬৪টি মকদ্দমা হয় এবং অবশেষে সকলের বেশি হয় ১৯৩০ সালে ৪৫,৪১৪টি। যথাসম্ভব আইনের সাহায্যে এবং অন্যত্র বেআইনীভাবে জমিদারেরা যে খাজনার হার বৃদ্ধি করেছেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পরগণা হারে যে খাজনা আদায়ের কথা স্থির ছিল তাঁর কথা তাঁরা স্বেচ্ছায় ভুলে গিয়েছেন।

জমিদারদের আয়বৃদ্ধির একটি কারণ এই যে, গত দেড় শত বৎসর ধরে তাঁরা যে অতিরিক্ত খাজনার পরিমাণ আদায় করে এসেছেন তার উপরে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো দাবি ছিল না এবং জমিদারের

লাভের অংশে সরকার বরাবরই বঞ্চিত হয়ে এসেছে। সে টাকা সরকারের হাতে থাকলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি প্রভৃতি জনহিতকর কাজে ব্যয় হবার সম্ভাবনা ছিল। একথা সকলেই জানে যে, অন্যান্য যে সব প্রদেশে রায়তওয়ারী প্রথা বর্তমান সে সকল স্থানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, জলসরবরাহ ইত্যাদির জন্য যে ব্যয় হয় তা বাংলাদেশের ব্যয় অপেক্ষা বেশি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা যে ভাবে বেড়ে গিয়েছে তা অন্য কোথাও দেখা যায় না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রারম্ভে এই শ্রেণীর কোনো সত্তা ছিল না এবং এই বন্দোবস্তের ফলেই বাংলাদেশে মধ্যস্বত্বপ্রথা এত অধিক হয়েছে। নতুন জমি চাষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের খাজনার আয় অনেক বেড়ে যায়। এই আয়ে ও রাজস্বের পরিমাণে যতই তফাত হতে লাগল ততই উক্ত শ্রেণীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। লাভের পরিমাণ কম ছিল বলে এবং খাজনা আদায়ের পরিশ্রম গ্রহণে অনিচ্ছায় জমিদারেরা একটি নির্ধারিত পরিমাণ টাকার পরিবর্তে সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনার ভার আর-একজনের হাতে অর্পণ করতেন। সেই প্রজা ও জমিদারের মধ্যবর্তী লোককে পত্তনিদার বলা হয়ে থাকে। তার কাজ খাজনা আদায় করে জমিদারের প্রাপ্য জমিদারকে দিয়ে বাকি অংশ নিজে গ্রহণ করা। কিন্তু দেখা যায় যে খাজনা আদায়ের কালে সেও নিজে সে কাজ করে না। জমিদারের মতো সেও খাজনা আদায়ের ভার আর-একজনকে দান করে। তাকে বলা হয় দরপত্তনিদার, এবং এই ভাবে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বেড়ে ওঠে। জমিদার ও চাষীর মাঝখানে বহুস্তরের মধ্যস্বত্বভোগী লোক দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে কোনো কোনো স্থানে এরূপ ১০-১৫টি পর্যন্ত শ্রেণী বর্তমান। প্রত্যেক শ্রেণীর স্বত্বভোগীদেরই সম্পত্তি হস্তান্তর করা ও উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করার অধিকার আছে। সকলের নীচে

যে শ্রেণী আছে সেই শ্রেণী চাষী বা রায়তের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে নিজের লভ্যাংশ রেখে বাকি টাকা তার পূর্ববর্তী শ্রেণীর হাতে অর্পণ করে এবং এই ভাবে খাজনার টাকা ক্রমে জমিদারের হাতে পৌছায়। জমির উপরে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন রকমের স্বার্থ থাকার দরুন জমিসংক্রান্ত বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। এই জটিলতা অর্থশালী জমিদারবর্গের যেমন সুবিধার কারণ গরিব চাষীদের পক্ষে তেমনই অসুবিধাজনক। জটিলতার দরুন জমিসংক্রান্ত মামলা-মকদ্দমা অত্যধিক হয়। কোর্ট-ফী বাবদে বৎসরে সরকারের ৩ কোটি টাকা আয় হয়। বলা বাহুল্য যে এই টাকা প্রকারান্তরে চাষীদের কাছ থেকেই লওয়া হয়।

সম্প্রতি জমির সমস্যা অধিকতররূপে বেড়ে যাওয়াতে সরকার এ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। দেশের অর্থনৈতিক বিনাশ প্রতিরোধ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে জমির প্রথা, বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্বন্ধে পরীক্ষা করে দেখার জন্য সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করেন। সার্ ফ্রান্সিস্ ফ্লাড এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। তাঁর নামে এই কমিশনকে ফ্লাড্ কমিশন বলা হয়। ফ্লাড্ কমিশন সমস্ত বিষয়টি পরীক্ষার পর এই মন্তব্য করেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়ে দেওয়া এবং সমস্ত জমিদারি ও মধ্যভোগীদের স্বত্ব সরকারের পক্ষ থেকে কিনে নেওয়া উচিত। এর জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ১৯৪০ সালে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাঁদের মন্তব্য অনুযায়ী এ পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি, নানা কৌশলে তা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ফ্লাড্ কমিশনের নির্দেশমত সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত স্বত্ব ক্রয় করা হলে, সরকারের আয় আরো অনেক কোটি টাকা বেড়ে যেত। তার ফলে প্রজাসাধারণের সাধারণ ব্যবস্থা অনেক অংশে উন্নত হত আশা করা যায়, কারণ সেই টাকা প্রজাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষির

কৃষি-ব্যবসায়ে আর বিন্দু মাত্র লাভ হয় না, কৃষিপ্রথা অত্যন্ত অনুপযুক্ত এবং চাষীরা সর্বত্র নিদারুণ ঋণের দায়ে জড়িত। প্রাকৃতিক দুর্দৈব—দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতির ঘন ঘন আবির্ভাব হয়। কিন্তু এই সব বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত খরচের টাকা চাষীর থাকে না এবং সহজেই সে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সুদের হার অত্যন্ত বেশি হওয়ায় সে ঋণ অতি দ্রুতভাবে বেড়ে চলে, অবশেষে ঋণের দায়ে চাষের জমিটুকু বিক্রি হয়ে যায়। তখন মহাজন এই জমি কিনে নেয়। জমিদারের খাজনা দিতে অসমর্থ হলে জমিদার প্রজার জমি হস্তগত করে সেটিকে খাসের অন্তর্ভুক্ত করেন। মনে হতে পারে যে জমিদার জমি খাস করে নিয়ে নিজে চাষ করেন, কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে ওই জমি তার পূর্বমালিককেই ভাগে বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। নিজে চাষ করা বা প্রজা বিলি করার চেয়ে জমি ভাগে বন্দোবস্ত দিলে লাভ বেশি হয়। অনুবর্তী অংশে সে বিষয় পরিষ্কার করে বলা হল।

উদাহরণস্বরূপ মনে করা যাক যে, একটি প্রজা জমিদারের কাছ থেকে এক বিঘা জমি প্রজা-বিলি নিয়েছে এবং সে জমিদারকে ১॥০ টাকা খাজনা দেয়। যতদিন পর্যন্ত সে তার জমি চাষ করবে ততদিন পর্যন্ত জমিদারকে ওই ১॥০ টাকা খাজনাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু অসময় আসে এবং চাষী ধার করতে বাধ্য হয়। কর্জের টাকা ক্রমশ স্ফীত হয়ে ওঠে এবং চাষীর পক্ষে শোধ করা অসাধ্য হয়ে পড়ে। তখন সে জমি বিক্রি করে ঋণ শোধ করা স্থির করে। জমিদার সে রায়তী জমি কিনে নেয়। অনতিপূর্বকাল পর্যন্ত আইন ছিল যে চাষীদের জমি বিক্রয়ের সময় সেই জমির উপর প্রথম দাবি হবে জমিদারের। সম্প্রতি এ আইন বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং চাষীরা-যে কোনো লোকের কাছে জমি বিক্রি করতে পারে যদিও সাধারণত তারা জমিদার বা মহাজনের কাছেই বিক্রি করে। কিন্তু জমিদার নিজে চাষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন

না, তিনি জমির পূর্ব মালিককেই সেই জমি ভাগে বিলি করে দেন। এর অর্থ এই যে, জমি এখন থেকে জমিদারের এবং শুধু চাষ করবার দায়িত্ব ভাগীদারের। বীজ, সার প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে শারীরিক শ্রম পর্যন্ত সকল খরচাই ভাগীদারের নিজের। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক নিজের ও বাকি অর্ধেক জমিদারকে দিতে হয়। কখনো বীজ ও সার দুই পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়, তখন সে অনুসারে ফসলের ভাগের তফাত হয়। এখন ধরা যাক যে, ভাগচাষী শুধু ধান উৎপন্ন করেছে, এবং ১ বিঘায় ৭ মন ফলন হয়েছে। মন-প্রতি ২৲ টাকা দরে ৭ মন ধানের দাম হয় ১৪৲ টাকা এবং খড়ের দাম ৪৲ টাকা নিয়ে মোট হয় ১৮৲ টাকা। এই ১৮৲ টাকার অর্ধেক ৯৲ টাকা পাবেন জমিদার যেস্থলে তিনি পূর্বে পেতেন ১৷৷০ টাকা; ভাগীদার পায় ৯৲ টাকা যেস্থলে নিজের পূর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ ১৮৲ টাকাই তার প্রাপ্য ছিল। এখন ধানের দাম প্রতি মন ৮৲ টাকা (চৈত্র ১৩৫০)। সে অনুসারে প্রত্যেক বিঘা ধানের জমির জন্য ভাগীদার জমিদারকে ৩০৲ টাকা করে দেয়। সুতরাং জমিদারি ও মহাজনি যে লাভজনক ব্যবসায় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যে কারণে জমি খাস করে ভাগে বিলি করে দিতে জমিদারের আগ্রহ দেখা যায় তা অত্যন্ত লোভনীয় সন্দেহ নেই। জমিদার ও মহাজনের লাভের আগ্রহে চাষী জমিচ্যুত হয়ে যায়।

এ বিষয়ে ফ্লাড্ কমিশন একটি তদন্ত করেন। ৮৫,৪৭০ একর জমি সম্বন্ধে সে তদন্ত করা হয়। সে তদন্তের ফলে দেখা যায় যে, এ জমির ৫৯২৩ একর গত ১২ বৎসরে বিক্রয়ের দ্বারা হাত বদল হয়েছে। এর থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, কত দ্রুত চাষীদের জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বিক্রীত ভূমি কি ভাবে চাষ হয় তাও রিপোর্টে লিখিত আছে। ২,২৫২ একর বা শতকরা ৩৮ ভাগ ক্রেতা নিজে চাষ করে; ১,৮৮২ একর বা শতকরা ৩১·৭ ভাগ ভাগীদার, ৩৪১ বা ৫·৭ ভাগ কৃষিমজুর ও ১,৪৪৭

একর বা শতকরা ২৪·৬ ভাগ নিম্ন রায়তের দ্বারা চাষ হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিক্রীত জমির প্রায় তৃতীয়াংশ ক্রেতা অন্য লোকের দ্বারা চাষ করায়।

উক্ত ফ্লাড কমিশনই ১৯,৫৯৯টি পরিবারে অনুসন্ধান করে দেখেন যে, শতকরা ১২·২ ভাগ চাষী-পরিবার বর্গাদার এবং ৬৩,৬৬৫ একর জমির মধ্যে ১৩,৪২৬ একর অর্থাৎ শতকরা ২১ ভাগ বর্গাদারেরা চাষ করে। কমিশনের মত এই যে, সমস্ত বাংলাদেশের কর্ষণাধীন ভূমির এক-পঞ্চমাংশ এই প্রথায় চাষ হয়।

বর্গাদার বা ভাগীদারের প্রথা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রজারা অধিকতর ভাবে অর্থশূন্য হয়ে পড়ে, কিন্তু খাজনা-আদায়কারীর লাভ বৃদ্ধি হয়। যুদ্ধের পূর্বে ফ্লাড কমিশনের হিসাবে কৃষির উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ছিল ১৪৩ কোটি টাকা। যদি দেশে ⅕ ভাগীদারদের দিয়ে চাষ হয় তবে সেই ভাগে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হয় প্রায় ২৮ কোটি টাকা। তার অর্ধেক ১৪ কোটি টাকার মূল্যের ফসল ভাগীদার তাদের মালিককে দেয়। ১৯৪৩-৪৪ সালে ফসলের যে বাজার-দর ছিল সেই অনুপাতে হিসাব করলে ওই টাকার অঙ্ক বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে। আদায়কারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মালিক চাষীর সংখ্যা কমে আসছে এবং জমিহীন কৃষিমজুরের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। বিস্তৃতভাবে এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, চাষীরা যতই দরিদ্র দশায় পতিত হয় জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর লাভের আশা তত অধিক হয়। দুর্ভিক্ষ বা মহামারিতে যখন চাষী সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে তখন মহাজনের দৃষ্টি থাকে কখন্ সে চাষী জমিটুকু তার কাছে বেচে দেবে কিংবা আর-একটি নূতন ঋণের তমসুক লিখে নেবে। চাষীরা যতই দেউলিয়া হয়ে পড়ে মহাজনের ব্যবসা ততই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসরে বাংলাদেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তার মতো দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে বিরল। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ

হারিয়েছে এবং বহু লোক প্রাণ বাঁচাবার জন্য চাষের জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে। সেই জমি কিনে নিয়েছে মহাজন কিংবা অবস্থাপন্ন লোকেরা, যারা নিঃসন্দেহ সেগুলি ভাগ-বন্দোবস্তে বিলি করে উচ্চহারে মুনফা গ্রহণ করবে। ১৯৪৩ সালে এত বেশি জমি বিক্রি হতে আরম্ভ হয়েছিল যে রেজেষ্ট্রি অফিসগুলিতে কাজ অসম্ভব রকমে বেড়ে গিয়েছিল। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে তার দরুন দাউদকান্দিতে একটি অতিরিক্ত রেজেষ্ট্রি অফিস খোলার প্রয়োজন হয়। রংপুর জেলায় নীলফামারীতে দুর্ভিক্ষের তিন মাসে ১১,৯১৫টি জমি-বিক্রির দলিল রেজেষ্ট্রি হয়। তার পূর্ব-বৎসরে এই সময়ের মধ্যে ৪,৩৬৮টি রেজেষ্ট্রি হয়েছিল। নারায়ণগঞ্জে দৈনিক ১৫০-১৯৫টি জমি বিক্রি বা বন্ধকের দলিল রেজেষ্ট্রি হয়। সাধারণ অবস্থায় এই অফিসে ১০।১৫টির বেশি রেজেষ্ট্রি হয় না। দুর্ভিক্ষের কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বাংলাদেশের ১০টি জেলায় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। জানা গিয়েছে যে বহুসংখ্যক গরিব চাষী জমি থেকে বিচ্যুত হয়েছে। যে সমস্ত পরিবারে অনুসন্ধান করা হয় তাদের মধ্যে শতকরা ২৫ থেকে ৩০টি পর্যন্ত খাদ্যের অভাবে জমি বিক্রি করে দিয়েছে দেখা যায়।

জমি হাতবদল সম্বন্ধে সার্ আজিজুল হক বলেন, "মধ্যস্বত্বভোগী প্রথার দরুন যে ক্ষুদ্র মালিক শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে তা বাংলার ভূস্বত্ব আইনের একটি অহিতকর ফল। ভূসম্পত্তির জন্য বাংলাদেশে এত অসাধারণ আগ্রহ দেখা যায় যে, যে মুহূর্তে কিছু পুঁজির সংস্থান হয় সে মুহূর্তেই বণিক, ব্যবসাদার, শিল্পমালিক ও মহাজন সকলেই জমিদারি কিংবা জমি ক্রয় করার জন্য ব্যগ্র হন। এ থেকে অবাধে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে বর্তমান কৃষিপ্রথায় লাভ বা অন্নসংস্থান না হলেও ভূস্বত্ব প্রথার দরুন জমির বা জমিদারির ব্যবসায় অতি লাভজনক। লেখকের মত এই যে, বিনাশ্রমে যথেষ্ট লাভ হওয়ার দরুন এবং জমিদারি সম্মান-

জনক বলে দেশে জমির মালিকের সংখ্যা বিস্তার হয়। কিন্তু এই কথা অর্থহীন। আসল কারণ এই দেখা গিয়েছে যে, দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা না হওয়াতে শিল্পব্যবসায়ের চেয়ে জমিদারিতে আয় বেশি হয় এবং মূলধন সম্বন্ধে অনেক বেশি নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

খণ্ডিত ও অসংবদ্ধ জোত

এদেশের জমি ক্রমে অল্পসংখ্যক লোকসমষ্টির হাতে এসে পড়ছে। এ কিছু নূতন ঘটনা নয়। ইউরোপের কোনো কোনো দেশেও এরূপ ঘটেছে এবং সেখানে এমন অনেক জমি অর্থশালী শ্রেণীর হস্তগত হয়েছে। এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, তার ফলে সে দেশে কৃষির উন্নতি সম্ভব হয়েছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি একত্রিত হয়ে এক সঙ্গে এক-একটি বড়ো কৃষিক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে।অনেকগুলি ছোটো ছোটো জোতের জায়গায় একটি বড়ো ক্ষেত্র স্থাপন উন্নতির পরিচায়ক। কারণ জোত বড়ো আয়তনের না হলে ও উপযুক্ত মূলধন ব্যয় করতে না পারলে প্রকৃষ্টভাবে, কৃষিকার্য করা যায় না ও তাতে লাভ হয় না। ইংলণ্ডের 'এনক্লোসার ম্যুভমেণ্ট' এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত।

ঋণগ্রস্ত চাষীদের কাছ থেকে জমি কিনে নেওয়ার পর জমির মালিক সে জমিতে আধুনিক প্রথায় চাষ করবে এ রকম মনে হওয়া উচিত। তার অর্থের সংস্থান আছে সুতরাং মূলধনের অভাব হবে না এবং যে সমস্ত চাষী জমিহীন হয়ে পড়ল তারাও কাজের সুযোগ পাবে। যদিও সামাজিক স্তরবিভাগে সে চাষীরা নীচে নেমে যাবে তবুও অর্থের অভাবে তাদের কষ্ট পেতে হবে না। এরূপ হওয়া প্রয়োজন ও উচিত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কিছুই হয় না। প্রজার জমি হস্তগত করার উদ্দেশ্য তাতে উন্নত প্রণালীতে চাষ করা এই নয়। খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। জমির মালিকেরা জমির দিকে দৃক্‌পাত করেন

না, পুরাতন প্রথাতেই জমি চাষ হয়। ভূস্বত্ব-আইনগুলি এমনভাবে গঠিত যে কৃষি যতই অবনত হয়ে পড়ে জমিদারের পক্ষে লাভের পথ ততই সুগম হয় এবং সেই সঙ্গে জোত ও জমি অধিকতর খণ্ডিত হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের জোতের তিনটি বিশেষত্ব দেখা যায়: ১. জোতগুলি ক্রমাগত ভাগ হয়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত। ২. জোতের ক্ষেত্রগুলি আয়তনে এত ক্ষুদ্র যে তাতে প্রকৃষ্টভাবে চাষ করা সম্ভব হয় না। ৩. তৃতীয়ত চাষীদের জোত একত্রে একটি খণ্ডে না হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু অংশে বিভক্ত এবং সেগুলি অসম্বন্ধভাবে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত। কি কারণে জোতগুলি এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তা একটি উদাহরণের দ্বারা স্পষ্ট হবে।

একটি চাষীর যদি ৮ একর জমি থাকে ও তার ৪ ছেলে থাকে তবে তার মৃত্যুর পরে জমি সমান ভাগ হয়ে প্রত্যেকে ২ একর করে পাবে। প্রথম পুত্র, যার হয়তো উৎসাহ বা সামর্থ্য আছে সে ২ একর জমিতে যথেষ্ট সংকুলান হয় না বলে আরো কিছু জমি ক্রয় করে। কিন্তু সচরাচর সে জমি তার পূর্ববর্তী জমির সংলগ্ন হয় না এবং বহুদূরে, হয়তো গ্রামের অন্যপ্রান্তে, সে জমি অবস্থিত থাকে। দ্বিতীয় পুত্রের পক্ষেও ২ একর জমি যথেষ্ট হয় না। কিন্তু সে অর্থের অভাবে নিজের জমি ভাগে দিয়ে দেয়। তৃতীয়ের হয়তো গোরু ও যন্ত্রপাতি সবই আছে কিন্তু নূতন জমি কেনার মতো অর্থ নেই। তখন সে অন্য কারও কাছ থেকে কিছু পরিমাণ জমি ভাগে বন্দোবস্ত করে নেয়। সে জমি সম্ভবত অনেক দূরে অবস্থিত থাকে। কনিষ্ঠ পুত্রের পক্ষে হয়তো অন্যান্যদের মতো কোনো উপায় গ্রহণই সম্ভব হয় না এবং শীঘ্রই ঋণগ্রস্ত হয়ে জমিহীন হয়ে পড়ে ও কৃষিমজুর হয়ে দিনপাত করে। আবার জ্যেষ্ঠপুত্র যার হয়তো তিন ছেলে আছে এবং জমি গ্রামের তিন দিকে তিনটি অংশে বর্তমান, সে

বৃদ্ধ বয়সে মারা গেলে তার তিন ছেলের মধ্যে সেই জমি সমান ভাগ হবে কিন্তু তিন খণ্ড খেতের প্রত্যেকটিকে নিয়ে এক-একটি ভাগ করা হয় না। কারণ প্রত্যেক খেতের জমি এক রকম হয় না। কোনোটিতে কতগুলি সুবিধা ও কোনোটিতে কতগুলি অসুবিধা থাকে। একটি হয়তো দোফসলী জমি, অন্যটিতে শুধুই ধান জন্মে, তৃতীয়টি হয়তো অনুর্বর। এই কারণে প্রত্যেক ছেলে এক-একটি খণ্ড গ্রহণ না করে প্রত্যেকটি খণ্ড বা ক্ষেত্রের এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করে যাতে জমি সকলের ভাগ সমান হয়। এর ফলে পূর্বের তিনটি খণ্ড নয়টি খণ্ডে পরিণত হয় এবং এইভাবে পুরুষানুক্রমে চাষের ক্ষেত্রগুলি টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ে। জরিপ রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে ঢাকা জেলার এক-একটি শস্যক্ষেত্রের আয়তন গড়ে ০·৫৫ একর। হরিরামপুর থানায় এই গড়-আয়তন ০·৩৬ একর ও কাপাসিয়া থানায় ০·৯১ একর। কিন্তু বর্তমানে যা দেখা যায় তাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রের আয়তন কয়েক কাঠা মাত্র।

উত্তরাধিকার-আইনের ফলে চাষের জমি ভাগ হয়ে যায় এবং ভাগচাষ প্রথার দরুন সে জমি পুনরায় বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। নিজের জমি যথেষ্ট না থাকাতে কোনো কোনো চাষী প্রয়োজনমত অপরের জমি ভাগে বন্দোবস্ত নেয়। ভাগ-নেওয়া জমি সাধারণত নিজ জমির নিকটবর্তী হয় না। জমি বিখণ্ডিত হওয়ার এও একটি কারণ।

জোত বিখণ্ড হলে প্রধান অসুবিধা এই যে, সে জোতের জমিতে যন্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা চাষ সম্ভব হয় না। আধুনিক কৃষিবিদ্যার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যন্ত্র-ব্যবহার। যুক্তরাষ্ট্রে, রাশিয়া ও কানাডায় কৃষিকার্যে অধিকতররূপে যন্ত্রের প্রয়োগ এবং কায়িক শ্রমের ক্রমশ বর্জন দেখা যায় কিন্তু তা সম্ভব শুধু সেক্ষেত্রে যেখানে চাষের জমি একটি ক্ষেত্রে আবদ্ধ ও একসঙ্গে অনেক পরিমাণ জমি চাষ করা সম্ভব। ওই সমস্ত দেশে এক-একটি কৃষকের অনেক পরিমাণ জমি থাকে এবং রাশিয়াতে জমি সরকারের

স্বত্বাধীন। সেই বিস্তৃত জমির উপর ট্র্যাক্টার-বাহিত কম্বাইন, লাঙল ও চাষের নানাপ্রকার যন্ত্রাদি বিনাবাধায় চালিত হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে তা সম্ভব হয় না। একটিমাত্র গ্রামের আয়তনের মধ্যে থাকে হাজার হাজার টুকরো খেত এবং খেতের মালিকও শুধু একজন নয়। জমিদার থেকে রায়ত এমন কি নিম্নরায়ত পর্যন্ত সকলেই একই জমির ফসলের অংশের অধিকারী। এরূপ অবস্থায় উন্নত ধরনের যন্ত্র ব্যবহারের কথা চিন্তাও করা যায় না। বাংলাদেশের সরকারী কৃষি-বিভাগের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা আছে। তার কাজ পরীক্ষা দ্বারা এদেশের উপযোগী কৃষিযন্ত্র আবিষ্কার করা। কিন্তু নূতন যন্ত্র বর্তমান অবস্থার উপযুক্ত করে তৈরি হয়। বলা বাহুল্য সে কারণে বহু বৎসরের চেষ্টাতেও এই বিভাগ বিশেষ কোনো উন্নতি করতে সমর্থ হয়নি।

পাঞ্জাবে সমবায় সমিতির সাহায্যে কতগুলি চাষীর খেত অদলবদল করে জোত একত্রীকরণের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টা বিশেষ ফল-প্রদ হয়নি এবং সে উপায়ে সন্তোষজনক ফললাভের সম্ভবনা কম।

বাংলাদেশে ঐকত্রিক চাষের একটি প্রচেষ্টা হয়। শ্রীযুক্ত সুশীল দে নদীয়া জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকার কালে কতগুলি চাষীর জমি একত্রিত করে দিয়ে কি ভাবে ৩টি সমবায় কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করে-ছিলেন তা তাঁর রচিত কো-অপারেটিভ ফার্মিং পুস্তকে বর্ণিত আছে। তার ফলে দেখা যায় যে শিল্পের সাহায্য ব্যতীত ঐকত্রিক চাষ ফলপ্রসূ হয় না, যদিও উক্ত সমবায় ক্ষেত্রে চাষের অনেক উন্নতি সম্ভব হয়েছিল।

কৃষিমজুর

কৃষির উপর নির্ভরশীল কিন্তু নিজের জমি নেই এই শ্রেণীর কৃষিজীবীরা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় দিনপাত করে। আমরা দেখেছি কালক্রমে কিভাবে গরিব চাষীরা জমিসংক্রান্ত আইনের ফলে ও আর্থিক অসংগতির দরুন একে একে জমি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। কোনো ক্রমে যাদের হালের গোরু ও লাঙলটি রক্ষা পায় তারা ভাগচাষী হয়ে জমি চাষ করতে পারে। কিন্তু যাদের সর্বস্ব চলে গিয়েছে তারা শুধু শারীরিক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে বাধ্য হয়। এখন এই কৃষিমজুর শ্রেণীর কথা আমরা আলোচনা করব।

সংখ্যার হিসাবে কৃষিমজুরের শ্রেণী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। সমগ্র কৃষিজীবীদের এক-তৃতীয়াংশ কৃষিমজুর। ফ্লাড্ কমিশন অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, ১৯,৫৯৯টি পরিবারের মধ্যে ৪,৪০৮টি অথবা শতকরা ২২·৫ ভাগ কৃষিমজুরের পরিবার। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারিতে উল্লেখ আছে যে কৃষিমজুর কৃষিজীবীদের শতকরা ২৯·২ ভাগ। যাই হোক এ কথা সত্য যে তারা সমগ্র কৃষিজীবীদের একটি বৃহৎ অংশ। তাদের জমি নেই, লাঙল নেই গোরু নেই ; অন্যের জমিতে কাজ করে যা পারিশ্রমিক পায় তা থেকেই খাদ্যবস্ত্রের সংস্থান করতে হয়। কোনো চাষীর পক্ষে যখন নিজের জমির কাজ বেশি হয়ে পড়ে তখন তার সাহায্যের প্রয়োজন হয় এবং কাজের পরিমাণ অনুসারে সে একটি কি তার বেশি মজুর নিযুক্ত করে। শস্য রোপণের সময় এক সঙ্গে অনেক লোকের প্রয়োজন হয় কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শস্য রোপণ না হলে ফসল খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে। ফসল কাটার সময়েও পরিপক্ক ফসল শীঘ্র কাটা না হলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সুতরাং দিনমজুরের সাহায্য নিয়ে কাজ সম্পন্ন করতে হয়। ধান

রোয়া, ধান কাটা, পাটখেতে আগাছা পরিষ্কার করা, আখ মাড়াই ও গুড় তৈয়ার প্রভৃতি কতকগুলি কাজে অতিরিক্ত লোকের প্রয়োজন হয় এবং তখন কৃষিমজুরদের সাহায্যে এ সমস্ত কাজ করা হয়ে থাকে। সারা বৎসর ধরে চাষের কাজ হয় না, কোনো বিশেষ কালে কাজ হয় এবং ঋতু-বিশেষে কাজের তারতম্য হয়। সুতরাং যে কালে কাজের মাত্রা বেশি থাকে সে সময়ে কৃষিমজুরদের কাজ পাবার সম্ভাবনা থাকে। অন্য সময় যখন কাজ সামান্য থাকে অথবা একেবারেই থাকে না, যেমন—গ্রীষ্মের সময় থেকে বর্ষা পর্যন্ত তখন মজুররা বেকার অবস্থায় বসে থাকতে বাধ্য হয়। তাদের সারা বৎসরের জন্য নিযুক্ত করার মতো কাজ থাকে না এবং কাজের সময়েও জমির মালিকের প্রয়োজনের অপেক্ষা করতে হয়।

এই শ্রেণীর মধ্যে একটি ভাগ দেখতে পাওয়া যায় যারা দৈনিক শ্রমিক হিসাবে কাজ করে না, একেবারে এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হয়। বীরভূম জেলায় মধ্যবিত্ত চাষীরা খেত-খামারের কাজের জন্য সর্বদা এ রকম একটি কৃষিমজুর বা ভৃত্য নিযুক্ত করে থাকে। চাষের সমস্ত কাজের ভার ওই ভৃত্যের উপর থাকে, মালিক শুধু তাদ্বির করেন। এই ভৃত্যকে বলা হয় মাহিনদার। মাহিন-দারেরা সাধারণত বার্ষিক ২০-৩০৲ টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক হিসাবে পায় এবং খাওয়া ও কাপড়চোপড়ের খরচা মালিকই বহন করে। খাদ্যের মধ্যে সচরাচর ডাল ভাত ও সামান্য একটুকু তরকারি দেওয়া হয়। সে খাবার মনিবের ঘরে বসে কিংবা নিজের বাড়ি নিয়ে খেতে পারে। বস্ত্রের মধ্যে ৪খানা ধুতি ও ২খানা করে গামছা মাহিনদারেরা প্রতি বৎসরে পায়। সাধারণ সময়ে তার মূল্য হয় প্রায় ৫৲ টাকা। পান, তামাক, গায়ে মাথার তেল ইত্যাদি তারা মনিবের কাছ থেকেই পায়। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে যে, একটি মাহিনদার তার মনিবের কাছ থেকে যা পায় তাতে তার নিজের

বেশ ভালোভাবেই চলে যায়। কিন্তু মাহিনা হিসাবে যে টাকা পায় তাতে তার পরিবারের ভরণপোষণ চলে না সুতরাং তাকে অন্য উপায় দেখতে হয়। তার স্ত্রী অন্যের বাড়িতে চাল তৈরি, ধান ভানা প্রভৃতি কাজ করে কিছু রোজগারের চেষ্টা করে, ছেলেটি উপযুক্ত হওয়ামাত্র তাকে কোনো অবস্থাপন্ন চাষীর বাড়িতে রাখালের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং এই সমস্ত সামান্য উপায়ে কোনো রকমে মাহিনদার নিজের স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা করে। তার নিজের কাজে কোনো ছুটি নেই, বৎসরের সমস্ত দিনই তাকে কাজ করতে হয়।

পূর্ববঙ্গে এই শ্রেণীর লোকদের বলা হয় চাকর বা কামলা। মাহিনদারদের চেয়ে তাদের মাহিনা বেশি হয়। খাওয়া পরা প্রভৃতি ছাড়া তারা প্রতি মাসে প্রায় ৫৲ টাকা করে পায়। কিন্তু মাসে ৫৲ টাকা পরিবারের সকলের খাওয়া-পরার পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং প্রয়োজনীয় অনেক বস্তু বাদ দিয়েই তাদের সংসার চালাতে হয়।

কৃষাণি নামে বীরভূম জেলায় একটি প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। জমির মালিক শুধু ফসলের সময়টুকুর জন্য একজন কৃষিমজুর নিযুক্ত করে এবং লাঙল, গোরু, যন্ত্রপাতি, বীজ প্রভৃতি সমস্ত নিজে দিয়ে চাষের কাজ করিয়ে নেয়। জমির খাজানা মালিক নিজেই দেয়। কৃষাণ শুধু নিজের পরিশ্রমে ফসল উৎপন্ন করে এবং তার বিনিময়ে ফসলের $\frac{1}{3}$ মজুরি হিসাবে পায়। শস্য কাটা না হওয়া পর্যন্ত কৃষাণকে তার প্রাপ্য পারিশ্রমিকের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু নিজের ও পরিবারের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন এবং ফসল কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার মতো পুঁজি তার থাকে না। অতএব কারও কাছ থেকে টাকা বা ধান কর্জ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। মনিবের কাছ থেকে ধান বা টাকা ধার করে কিন্তু তার বিনিময়ে সে মনিবের যে-কোনো কাজ করতে বাধ্য থাকে এবং সে কাজের জন্য প্রচলিত কাজের চেয়ে কম মজুরি গ্রহণ

করে। অবসরকালে মনিবের কাজ ছাড়া অন্যকাজও কৃষাণরা করতে পায়। ফসল ভাগ হওয়ার সময় জমির মালিক দুই-তৃতীয়াংশ নিজে নিয়ে বাকি অংশ থেকে ঋণশোধবাবদ তার প্রাপ্য কেটে নেয়। এর ফলে কৃষাণের ভাগে সাধারণত কিছুই থাকে না, উপরন্তু ঋণও সম্পূর্ণ শোধ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে এই হয় যে কৃষাণ সে ঋণ কখনো শোধ করতে সমর্থ হয় না এবং তাকে চিরকাল মনিবের আজ্ঞাধীন হয়ে কাটাতে হয়। ঋণ শোধ না হলে মনিবের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া দুঃসাধ্য। কোনো কারণে ফসল নষ্ট হয়ে গেলেও কৃষাণকে ঋণের দ্বারস্থ হতে হয় এবং সকলেই জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে অজন্মা প্রায়ই হয়ে থাকে। কৃষিমজুররা যে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে তার হার অত্যন্ত কম। নীচে দৈনিক মজুরির যে অঙ্কগুলি দেওয়া হল তার থেকে আরো স্পষ্ট বোঝা যাবে :

দৈনিক মজুরির হার (আনা)

	১৯১১	১৯১৬	১৯২৫	১৯৩৯		১৯৪৩
				ফসল কাটার সময়	অন্যান্য সময়	
বর্ধমান	৫·২৫	৭·২৫	১১	৫·৭৫	৩·৫	
বীরভূম	৩·৩৮	৫	৭	৩·৭৫	২·৭৫	
বাঁকুড়া	৩·৭৫	৪·৭৫	৯	৩·৫	২·৫	
মেদিনীপুর	৪·২৫	৫·২৫	৮	৪	৩	
মুর্শিদাবাদ	৩·৬৩	৪·৫	৮	২·৭৫	২·৭৫	১২-২৪
নদীয়া	৪·৮৮	৪·৭৫	৯	৩·২৫	২·৭৫	
রাজসাহী	৭	৮·২৫	১৫	৪	২·৭৫	
রংপুর	৮	৭·৭৫	১০	৩·৭৫	২·২৫	
মালদহ	৫	৫	৬	২ ৭৫	২·৭৫	
ঢাকা	৬	৭·৫	১২	৪·২৫+খাদ্য	...	
ময়মনসিংহ	৮	৭·৫	১৩	৩·২৫+খাদ্য	...	
ত্রিপুরা	৭	৫·৭৫	১১	৪·২৫	২·৭৫	

এই তালিকায় বিভিন্ন জেলার মজুরির পরিমাণ দেখানো হয়েছে। ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ববঙ্গীয় জেলাগুলিতে মজুরির হার কিছু বেশি এবং পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম ও মেদিনীপুরে মজুরির হার কম। মোটের উপর যেখানে জমি উর্বর ও যেখানে অর্থকরী ফসল উৎপন্ন হয় সেখানে মজুরির হার বেশি এবং যেখানকার জমি খারাপ সেখানে কম। মালদহ জেলায় সাঁওতালের বাস আছে, সে কারণে সেখানকার কৃষি-মজুররা বেশি পারিশ্রমিক পায় না। দেখা যাচ্ছে যে ১৯১১ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে সর্বত্র মজুরির হার বেড়েছে।

১৯১১ সালে বীরভূম জেলায় ৵৹ আনা ও ময়মনসিংহে ॥৹ আনা ছিল। কিন্তু ১৯১৬ সালে প্রায় সব জেলাতেই তা কিছু পরিমাণে বেড়ে যায় এবং ১৯২৫ সালে হয়ে যায় ১৯১১ সালের হারের দ্বিগুণ। ১৯৩০ সালে যখন সমস্ত ফসলের দাম কমে যায় তখন কৃষিমজুরদের মজুরিও সেই সঙ্গে কম হয়ে যায় এবং যুদ্ধের পূর্বে ফসলের দাম বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত অবস্থা সমান ছিল। ১৯৪৩ সালে চালের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল এবং মজুরির হারও বেশি হয়েছিল। সে বৎসর দৈনিক মজুরির হার ছিল ৸৹—১॥৹ টাকা।

অর্থাগমের যে সামান্য পথ খোলা থাকে তাতে কৃষিমজুরদের জীবনরক্ষা করা দুরূহ এবং কতক অর্ধ আহারে ও অধিকাংশই উপবাসের ধার দিয়ে বাস করে। তারা যে বেঁচে থাকে সেইটিই আশ্চর্য। কোনো রকম আর্থিক পরিবর্তনে যেমন খাদ্যবস্তুর দামবৃদ্ধি বা মজুরি কম হয়ে যাওয়া কিংবা শারীরিক অসুস্থতার দরুন কাজ করতে অসমর্থ হলে তাদের কষ্টের আর সীমা থাকে না। ১৯৪৩ সালে জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব রকমে বেড়ে যায়। চাল ছিল প্রতিমন ৩০—৫০৲ টাকা, কোনো কোনো জায়গায় ৭০-৮০৲ টাকা, এমন কি ১০০৲ টাকা পর্যন্ত। মজুরের রোজগারের সমস্ত টাকাই খাদ্যবস্তুতে খরচ হয়ে যায় এবং খাদ্যবস্তু বলতে প্রধানত চালই বুঝায়। কিছু চাল নিজের জন্য রেখে বাকি অংশ বিক্রি করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনবে এমন অবস্থা কৃষিমজুরের নয়। যে ফসল সে নিজের পরিশ্রমে উৎপন্ন করে তার উপর তার নিজের কোনো দাবি নেই। তাকে চাল কিনেই খেতে হয়। কৃষিজীবীদের কোনো কোনো শ্রেণী ধান চালের দাম বৃদ্ধি হওয়াতে অত্যন্ত লাভবান হয়েছে কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মজু শ্রেণী। মালিক-চাষী, জোতদার, আড়তদার প্রভৃতি সকলে মূল্যবৃদ্ধির ফলে অল্প সময়ে অনেক টাকার অধিকারী হয়েছে। মহাজনদেরও প্রকারান্তরে অনেক সুবিধা

হয়েছে, কারণ বাকি ঋণের টাকা অনেক আদায় করা সম্ভব হয়েছে, জমিদারেরা খাজনার টাকা অন্যান্য বৎসরের চেয়ে সহজে ও বেশি পরিমাণে পেয়েছেন এবং অবস্থাপন্ন চাষীরা উচ্চহারে ফসল বিক্রয় করে অধিকতর ধনসম্পদলাভ করেছে। অন্য দিকে যারা দরিদ্র তাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যের মূল্য বেড়ে যাওয়াতে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছে। তাদের মধ্যে কৃষিমজুরের সংখ্যাই বেশি। কারণ যে পারিশ্রমিক তারা রোজগার করেছে তার হার বৃদ্ধি পেলেও খাদ্যবস্তুর মূল্যের তুলনায় তা অনেক কম। অনাহারে ও রোগে এই শ্রেণীটি প্রায় বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। দুর্ভিক্ষের সময় নিরন্ন লোকের দল খাদ্যের আশায় কলিকাতা শহরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। সন্ধান নিয়ে জানা গিয়েছে যে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কৃষিমজুর শ্রেণীর লোক।

উপরের তালিকায় দেখানো হয়েছে যে ১৯১১ থেকে কৃষিমজুরদের পারিশ্রমিক ১৯৩০ সালে আর্থিক মন্দার পূর্ব পর্যন্ত ক্রমে বেড়ে গিয়েছে। ১৯৩০ সাল থেকে যুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত তা আবার কমে যায়। তাদের আর্থিক অবস্থার প্রকৃত উন্নতি হয়েছিল কি না তা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। নীচে আর-একটি তালিকা প্রস্তুত করে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতি টাকায় চালের দর এবং কৃষিমজুরদের মজুরির পরিমাণ তুলনা করে দেখানো হল।

	১৮৪২	১৮৫২	১৮৬২	১৮৭২	১৯১১	১৯২২	১৯২৫	১৯৩৯	১৯৪৩
মজুরির হার (আনা)	১	১$\frac{১}{২}$	২	৩	৪	৪-৬	১০	৭$\frac{৩}{৪}$	১৬
	১০০	১৫০	২০০	৩০০	৪০০	৪০০-৬০০	১০০০	৩৭৫	১৬০০
মনপ্রতি চালের দাম (টাকা)	১	১$\frac{১}{৩}$	১$\frac{১}{২}$	১$\frac{৯}{১১}$	২$\frac{২}{৩}$	৮	৭	৩$\frac{১}{২}$	৩৫
	১০০	১৩৩	১৫	১৮২	২৬৬	৮০০	৭০০	৩৫০	৩৫০০

মজুরির হার—১৮৪২ = ১০০ চালের দাম—১৮৪২ = ১০০

১৮৪২-১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চালের দাম ও মজুরির হার দুইই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চালের দামের চেয়ে মজুরির হার বেশি হওয়াতে মজুরদের স্থবিধা হয়েছিল। কিন্তু ১৯২২ সালে চালের দাম ৮ গুণ বেড়ে যায় এবং মজুরির হার বাড়ে মাত্র ৪-৬ গুণ। তারপরে অবস্থা একটু ভালো হয়ে আবার ১৯৩০ সালের পরে খারাপ হয়ে পড়ে। আর্থিক মন্দার কালে মজুরি কমে গিয়েছিল সত্য কিন্তু তখন চালের দামও কম ছিল। সকলের চেয়ে খারাপ অবস্থা আসে ১৯৪৩ সালে যখন চালের দাম ৩৫ গুণ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে কী হয়েছিল তা বাংলাদেশের কারও অজ্ঞাত নয়।

অন্য সব শ্রমিকদের চেয়ে কৃষিমজুরেরা অনেক কম পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। গ্রাম-অঞ্চলে সকল শ্রেণীর মজুরদের পারিশ্রমিক অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু তাদের মধ্যে কৃষিমজুরদের মজুরি সকলের চেয়ে কম হয়। ১৯২৫ সালের বাংলাদেশের চতুর্থ মজুরিসংক্রান্ত আদমস্থমারিতে কামার, ছুতার ও কৃষিমজুরদের দৈনিক পারিশ্রমিক পাশাপাশি দেখানো হয়েছে। কয়েকটি জেলার হিসাব সেখান থেকে উদ্ধৃত করা হল।

জিলা	কৃষিমজুর (আনা)	ছুতোর (আনা)	কামার (আনা)
চব্বিশপরগণা	১০	১৮	২১
বাঁকুড়া	৯	১৫	১৩
খুলনা	১৩	১৬	১৬
পাবনা	৩১	২০	১৬
ফরিদপুর	১৩	১৬	১৬
বাখরগঞ্জ	১২	১৫	১২

পৃথিবীর অন্য সব দেশের কৃষিমজুরদের দৈনিক পারিশ্রমিকের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে এদেশের মজুরি কত সামান্য তা আরো স্পষ্ট বোঝা যাবে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপান গভর্মেণ্টের স্ট্যাটিষ্টিকেল বুরো থেকে ৬৭০টি কৃষিমজুর পরিবারে অনুসন্ধান নিয়ে দেখা গিয়েছিল যে, প্রত্যেক পরিবার গড়ে ১২৮৲ টাকা প্রতি মাসে উপার্জন করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৪ সালে কৃষকদের মাথা-পিছু আয় ছিল বৎসরে ২৮১ ডলার।* রাশিয়াতে ১৯২৬ সালে সমস্ত কৃষিজীবীদের জন-প্রতি গড়-আয় ছিল ৬৮·৪ রুব্‌ল; ১৯৩৮ সালে বেড়ে গিয়ে কৃষি পরিবারপ্রতি ১০০০ রুবলে দাঁড়ায়।

ইংলণ্ডে কৃষিমজুরদের নিম্নতম মজুরি আইনের দ্বারা বেঁধে দেওয়া হয়। যুদ্ধের পূর্বে গড়ে প্রত্যেক কৃষি শ্রমিক সপ্তাহে ২১৲ টাকা (৩১½ শি) করে পেত। সে টাকায় তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের প্রয়োজন মিটিয়ে সামান্য কিছু বেশি হত। শুধু খাওয়া ও পরার জন্য প্রয়োজন হয় ২৯ শি. ৩ পেন্স এবং তাতে তিনটি পুত্র-কন্যা নিয়ে একটি পরিবার জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ক্রয় করতে সমর্থ হয়।

* ১ ডলার = ২·৭ টাকা। ১ রুব্‌ল = ১·৪ টাকা ১½ শিলিং = ১ টাকা।

অন্য সব দেশের মজুরদের যে পারিশ্রমিকের কথা বলা হয়েছে তা সকলই যুদ্ধের পূর্বাবস্থার। যুদ্ধের সঙ্গে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং সাধারণ জীবনযাপন কঠিন ও কোনো কোনো স্থলে দুঃসাধ্য হয়েছে।

চাষীর ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশের চাষীর বর্তমান অবস্থা এতই খারাপ যে অনেকেরই মনে হয় যে, তার উন্নতির আর কোনোই আশা নাই। অবস্থা পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা হলেও সে সুদূরপরাহত এবং যে সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থা উন্নতির পথে বাধা হয়ে আছে সেগুলিকে পরাভূত করা অত্যন্ত কঠিন। এ বিষয়ে যাঁরা বরাবর চিন্তা করে এসেছেন তাঁদের কাছেও ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে মনে হয়। কিন্তু অবস্থা নৈরাশ্যজনক বলে বোধ হলেও উন্নতির যথেষ্ট পথ খোলা আছে। এমন ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব যাতে চাষীরা শুধুই যে খেয়ে-পরে থাকতে পারবে তা নয়, শিক্ষায় ও আনন্দে উন্নত ধরনের জীবনধারণ করতে সমর্থ হবে।

আমাদের দেশের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কৃষি-সম্বন্ধে যে সমস্ত আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে তার সঙ্গে প্রকৃতক্ষেত্রে যে প্রথায় চাষ হয় সে প্রথার কোনো সামঞ্জস্য নেই। দেড় শত বৎসরেরও পূর্বে বেকওয়েল ইংলণ্ডের গোরু, ভেড়া প্রভৃতি পশুর প্রজনন ও সঙ্কর উৎপাদনের নিয়ম আবিষ্কার করেন। লিবিগ বৈজ্ঞানিক সার আবিষ্কার করেন বহুদিন পূর্বে। সেই সময় থেকে কৃষিবিজ্ঞান নানাদিকে প্রসার লাভ করেছে। অনেক দেশে বৈজ্ঞানিক সারের দ্বারা শস্যের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এক সময় যখন শস্যখাদক কীটের উৎপাতে সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যেত তখন অসহায় চাষীদের ফসলের অভাবে কষ্টে দিনপাত করতে হত। কিন্তু এখন যন্ত্রের সাহায্যে কীটের গায়ে বিষ

ছড়িয়ে অনায়াসে সেগুলিকে ধ্বংস করা যায় এবং ফসল রক্ষা করা সম্ভব হয়। বিস্তৃত ক্ষেত্রের উপর কীটের আক্রমণ হলে এরোপ্লেন থেকে বিষ নিক্ষেপ করে কীট নষ্ট করার উপায়ও অধুনা আবিষ্কৃত হয়েছে। শস্যের রোগ বা মারী, যার দরুন গত শতাব্দীতে আয়র্লণ্ডে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছিল তার বিভীষিকা দূর হয়েছে। বৃষ্টির অভাবে যে বিস্তৃত জমিতে শস্য উৎপাদন অসম্ভব ছিল কৃত্রিম উপায়ে জলসেচনের দ্বারা সেখানে ফসল তৈরি সম্ভব হয়েছে। বহু জলাজমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে ছিল, জলনিকাশের ব্যবস্থা করে সেই জমিতে এখন মূল্যবান ফসল উৎপন্ন করা হচ্ছে। মেণ্ডেলের নীতি অনুসারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাজাতীয় শস্যের প্রকৃতি পরিবর্তনের দ্বারা তাদের প্রকৃষ্টতর জাতিতে পরিণত করে প্রয়োজনীয় গুণ বৃদ্ধি করাও এখন সম্ভব। কাঠের লাঙল, মুগুর, কাস্তে প্রভৃতির স্থানে অনেক উন্নততর বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আজকাল একটা কম্বাইন শস্যক্ষেত্রেই শস্য কাটা থেকে আরম্ভ করে শস্য ঝাড়া পর্যন্ত সকল কাজ একসঙ্গে করতে পারে এবং এতে খুব কম লোকের প্রয়োজন হয়। পূর্ব নিয়মে কাঠের লাঙল দ্বারা এখন জমি চাষ হয় না। ট্র্যাক্টারের আবির্ভাবে সমস্ত পুরানো প্রথার আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং চাষ দেওয়া, জমি নিড়ানো, বীজবপন ইত্যাদি সমস্ত কাজ ওই ট্র্যাক্টারের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। রাশিয়ায় বিস্তৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে পশু প্রজনন (Artificial insemination) করা হয়। বীজ ভারনেলাইজ করে অল্প সময়ে বেশি ফলন পাবার উপায় সৃষ্ট হয়েছে। কৃষিবিদ্যায় বিজ্ঞানের এরূপ প্রয়োগ হওয়াতে এ যুগের কৃষিবিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। স্বভাবতই এর ফলে চাষীর আর্থিক অবস্থাও উন্নত হয়েছে।

বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশে বহু বৈজ্ঞানিক কৃষিবিষয়ে নানাপ্রকার গবেষণার কাজে নিযুক্ত আছেন। কী উপায়ে কৃষিকে আরো দ্রুত

উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়া যায় তারই চেষ্টা চলেছে। এই কাজে আমেরিকা প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকা ব্যয় করে এবং রাশিয়াও সেই পথ অনুসরণ করেছে। রাশিয়াতে ৯০টি কৃষিসংক্রান্ত গবেষণাগার, ৩৬৭টি পরীক্ষাগার, ৫০৭টি পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র ও ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রগুলির সংলগ্ন ২০,০০০টি ছোটো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কেন্দ্র আছে। ১৪০০০ জন বৈজ্ঞানিক সেখানে কৃষিবিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

আমাদের দেশে কৃষিবিষয়ে গবেষণা শুধু প্রাদেশিক গভর্মেণ্টগুলি কিছু পরিমাণে করে ও সামান্যমাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হয়ে থাকে। ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচালের রিচার্স গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং তৎপ্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করে থাকে। বাংলাদেশে ঢাকায় একটি গবেষণার কেন্দ্র আছে এবং চুঁচুড়া, বরিশাল, বাঁকুড়া, সিউড়ি, কৃষ্ণনগর, বুড়ীরহাট প্রভৃতি স্থলে পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র আছে। এই ক্ষেত্রগুলির প্রথম ৪টি ধান বিষয়ে ও পরে ২টি ক্রমান্বয়ে ফল ও তামাকের পরীক্ষাক্ষেত্র।

কৃষিবিজ্ঞানে এত গবেষণা এবং উন্নত প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের চাষীদের সেই উন্নত প্রথা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হওয়ার কারণ কী? বাংলাদেশে সরকারী কৃষিবিভাগ উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালীগুলির সঙ্গে চাষীদের চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য একদল সুদক্ষ কৃষিবিদ্‌ নিযুক্ত করেছেন। গত ৩৮ বৎসরেও বেশিকাল যাবৎ এই বিভাগ সে কাজ করে এসেছে, কিন্তু চাষীদের শস্যক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে একমাত্র আখ ছাড়া অন্য কোনো ফসলে পূর্বের ও বর্তমান অবস্থার মধ্যে কোনো প্রভেদ লক্ষ্য হয় না। পৃথিবীর অন্য সব দেশে কৃষিবিজ্ঞানের দ্রুত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন সম্ভব হচ্ছে কিন্তু বাংলার চাষী এখনো সেই মান্ধাতার আমলের পুরানো প্রথায় চাষ করে চলেছে। এর জন্য অনেকে দায়ী করেন চাষীদের অশিক্ষাকে। তাঁদের ধারণা এই যে,

চাষীদের যদি উপযুক্ত রকমে শিক্ষা দেওয়া যায় তবে তারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলির সার্থকতা বুঝতে পারবে এবং সে প্রণালী প্রয়োগের দ্বারা কৃষির ও নিজের উন্নতি সাধনে তৎপর হবে। কিন্তু এই ধারণা ভ্রমাত্মক।

যে ব্যবস্থায় আমাদের কৃষি পরিচালিত হয় সে ব্যবস্থাই বিজ্ঞানের প্রয়োগের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। ভূস্বত্ব-আইন এবং সামাজিক ও অর্থগত স্তরবিভাগও তার জন্য দায়ী। বিজ্ঞান ব্যতীত চাষের ও চাষীদের অবস্থা যে উন্নত করা সম্ভব নয় তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমরা পূর্বেই দেখেছি কিভাবে উত্তরাধিকার-আইনের ফলে জোত বিখণ্ডিত ও ক্ষুদ্র অংশে ভাগ হয়ে পড়ে। এই সমস্ত ক্ষুদ্রায়তনের জমিতে মূলধন ব্যয় করে লাভবান হওয়া যায় না। চাষীরা গরিব, ঋণ ও উচ্চ হারের খাজনার দায়ে তারা সর্বদাই ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। সুতরাং যথোপযুক্ত মূলধন ব্যয় করে তারা প্রকৃষ্টভাবে কৃষিচালনা করবে এ কখনো আশা করা যায় না। তাদের দারিদ্র্যই কৃষির অনুন্নত অবস্থার কারণ। আবার কৃষির অপকর্ষের দরুন দারিদ্র্য আরো বেড়ে চলে।

কৃষির এই সংকটের জন্য তিনটি শ্রেণী স্পষ্টত বা প্রকারান্তরে দায়ী। তাদের মধ্যে আছে জমিদার, মহাজন ও বিদেশী মূলধনওয়ালা। বর্তমানে যে নিয়মে কৃষির কাজ চলেছে সে নিয়মগুলি বজায় থাকলে এই তিন শ্রেণীর লোকের স্বার্থরক্ষা হয় এবং সেই কারণে বর্তমান আর্থিক নীতির কোনো পরিবর্তনে যদি তাদের স্বার্থহানির আশঙ্কা হয় তবে তারা তার প্রবল বিরুদ্ধতা করে। যে সরকার আমাদের শাসনের ভার গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাজের ধারাও বিদেশী মূলধনওয়ালাদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সকল কাজে তাদের স্বার্থ বজায় রেখে চলা হয়। জমিদার ও মহাজনশ্রেণী সর্বদা সরকারের সমর্থনকারী, যেহেতু শক্তিমান সরকারের সহায়তায় তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। চাষীদের কষ্ট দূর

করার উদ্দেশ্যে নানা প্রচেষ্টা সরকারের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে কিন্তু এমন কোনো নীতি অবলম্বন করা হয় না যাতে বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। অবস্থা যখন অত্যন্ত সঙ্গিন হয়ে পড়ে তখন স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে সাময়িক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। এতাদন পর্যন্ত সেভাবেই চাষীদের উন্নাত করার চেষ্টা হয়ে এসেছে।

জমিদারেরা, যারা জমির প্রকৃত মালিক তাদের জমির সঙ্গে কোনো যোগ নেই, তাদের লক্ষ্য থাকে কেবল খাজনার উপরে। তাদের কাছে জমিদারি একটি লাভজনক ব্যবসায়। কেউ কেউ এ কথা প্রায়ই বলেন যে জমিদারির অবস্থা বর্তমানে বড়ই খারাপ এবং বহু জমিদারি সে কারণে বিক্রয় হয়ে গিয়েছে। কোনো কোনো বিশেষ জমিদারিতে যেখানে প্রজার কাছ থেকে প্রাপ্ত খাজনার পরিমাণ উর্ধ্বতন মালিক বা সরকারকে দেয় রাজস্বের চেয়ে খুব বেশি হয় না, সেই বিশেষ জমিদারি সম্বন্ধে উক্ত মত সম্ভবত সত্য। কোনো বিশেষ জমিদার বা জমিদারেরা দেউলিয়া হয়ে পড়লে তাতে চাষীদের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। তাদের বা চাষের উন্নাত বিধানের জন্য জমিদারেরা কিছুই করেন না। রথামস্টেড এগ্রিকাল্চারেল স্টেশনের ডিরেক্টর স্যর জন রাসেল ভারতে শস্য উৎপাদনের কাজে বিজ্ঞানের কতদূর প্রয়োগ সম্ভব তা পরীক্ষা করতে এদেশে এসেছিলেন। তাঁর রিপোর্টে তিনি এই অনুযোগ করেছেন যে এদেশে কৃষির উপর নির্ভরশীল অবস্থাপন্ন সেই আভজাত সম্প্রদায়ের অভাব, যারা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি পরিচালনার সার্থকতা সহজে উপলব্ধি করতে পারে। বলা বাহুল্য যে আমাদের জমিদারগণ সাধারণত এই শ্রেণীরই লোক কিন্তু বিনাশ্রমে অর্থ উপায়ের পথ সুগম হওয়াতে তারা কোনো রকম দায়িত্ব গ্রহণে আনচ্ছুক। কিন্তু ইংলণ্ডে দেখা যায় যে সেখানকার ভূস্বামীগণ সর্বদা জমির উন্নতির কাজে অগ্রসর হয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যে চাষীদের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। আমাদের

৫

জমিদারেরা চাষীর উন্নতি করা দূরে থাকুক সে উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রথার পরিবর্তন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধতা করেন। ফ্লাড কমিশন সকল অবস্থা পরিদর্শন করে বর্তমান ভূ-সংক্রান্ত ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। তাঁদের প্রস্তাবে ছিল যে সমস্ত জমির সকল প্রকার স্বত্ব (রায়তের স্বত্ব ছাড়া) সরকারের পক্ষ থেকে ক্রয় করে নেওয়া কর্তব্য। কিন্তু কমিশনের মধ্যেই অনেকে জমিদার ও তাদের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। রিপোর্টে এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে যাঁরা স্বাক্ষর দান করেন তাঁদের সংখ্যাই বেশি হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাব অনুযায়ী এ পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি এবং কোনো না কোনো অজুহাতে তা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছে। সরকারের উপর জমিদারদের প্রভাব থাকাতে বাধাদান সহজ ও সফল হয়।

মহাজনেরাও জমির বর্তমান ব্যবস্থার বিশেষ পক্ষপাতী। জমিদারী ও মহাজনী ব্যবসায় পরস্পরবিরোধী নয়। এমন অনেক লোক আছে যারা জমিদারী ও মহাজনী ব্যবসায় দুই-ই করে। চাষীদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে মহাজনেরা চিন্তিত হয় না। বস্তুত পূর্বকথিত উপায়ে চাষীদের অবস্থা খারাপ হলেই মহাজনদের ব্যবসার সুবিধা হয়।

এই দুই শ্রেণীর স্বপক্ষে আর-একটি প্রবলশক্তিসম্পন্ন শ্রেণী আছে, সে হচ্ছে বিদেশী মূলধনওয়ালার শ্রেণী। এই শ্রেণীর ক্ষমতা অসীম এবং এদের স্বার্থের বিরোধী কোনো কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। ভারতবর্ষ একটি ঔপনিবেশিক রাজ্য এবং অন্যান্য দেশের, বিশেষত ইংলণ্ডের, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য এদেশ কাঁচামাল উৎপন্ন করে। সুতরাং যে বিদেশী বণিকগণ তাদের কারখানায় প্রস্তুত মাল এদেশে চালান করে, তাদের নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তারা এই চায় যে ভারতবর্ষে শুধু কাঁচামালই উৎপন্ন হয় এবং তার দ্বারা বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের বাজার খোলা থাকে। এর ফলে বিদেশী বণিকগণ শুধু যে কাঁচামাল

সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকবে তা নয়, তাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধেও তারা নিশ্চিত হবে। প্রশ্ন হতে পারে যে, এই মূলধনওয়ালার শ্রেণী কৃষির উন্নতিতে অনিচ্ছুক কেন, কারণ কৃষির উন্নতি হলে কাঁচামালের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। সে কথা হয়তো সত্য, কিন্তু অবনত কৃষি ও চাষীদের আর্থিক হীন অবস্থায় সস্তায় কাঁচামাল লাভের সম্ভাবনা; কৃষি উন্নত হলে এবং কাঁচামাল-বিক্রয়কারীগণ সংঘবদ্ধ হলে শিল্পমালিকদের লাভের পথে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা আছে। তাদের হয়তো উচ্চহারে মাল খরিদ করতে হবে। পাটের ব্যাপারে এ সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দেখানো যায়। বাংলাদেশের পাটকলের মালিকগণ পাটের দাম নিম্নতম হারে স্থির রাখার জন্য যথাশক্তি বলপ্রয়োগ করে এবং বাংলার সরকার পাট উৎপন্ন ও পাট ব্যবসায় সম্পর্কে কোনো কাজে ইণ্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে পরামর্শ ভিন্ন অগ্রসর হতে পারে না।

বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠাও বিদেশী বণিকদের জন্য হতে পারে না। কারণ এদেশে শিল্পজাত পণ্য প্রস্তুত হলে বিদেশী পণ্যের বিক্রয় বন্ধ হয়ে যাবে। সে কারণে তাদের ইচ্ছা এই যে ভারতবর্ষে শুধু কৃষিজাত দ্রব্যই উৎপন্ন হোক। যাতে কোনো প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয় সেজন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যুদ্ধের প্রথমে যখন ভারতীয় মূলধনওয়ালাগণ এদেশে জাহাজ, এরোপ্লেন ও মোটরগাড়ি প্রভৃতি নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করেন তখন তা অগ্রাহ্য হয়। সার্ আর্থার ম্যার ইংলণ্ডের বিখ্যাত শিল্প-মালিক লর্ড বিভারব্রুককে ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে অনুরোধ করায় তিনি বলেন, "বিকৃতমস্তিষ্ক না হলে এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

আমাদের দেশে শিল্পের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ও ভবিষ্যতে তার উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে চিনির ব্যবসায় যেভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে তা এদেশে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠা আধুনিক প্রথায়

প্রকৃষ্টভাবে চালিত হবার পক্ষে একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। এদেশে অনেক অর্থশালী লোক আছেন যাঁরা নূতন শিল্পব্যবসায়ে মূলধন ব্যয় করতে উৎসুক। পুঁজি হলেই স্বভাবত সেটি লাভজনক ব্যবসায়ে ব্যয় করার ইচ্ছা জন্মে এবং যাদের সেই সংস্থান আছে তাঁরা আজকাল নানা প্রকার তৈরি মাল উৎপাদনের চেষ্টা করেন। সম্প্রতি রাসায়নিক দ্রব্য ও নানা ঔষুধপত্র এদেশেই প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে যথেষ্ট মূলধন খাটাবার পক্ষে প্রয়োজনীয় নূতন শিল্প সীমাবদ্ধ। সে কারণে পুঁজিওয়ালা লোকেরা জমিদারি বা তেজারতি ব্যবসায়ে বেশি টাকা ব্যয় করেন। তার ফল এই হচ্ছে যে জমি ক্রমশ এমন লোকের হাতে চলে যাচ্ছে যারা চাষী নয়।

শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা হলে বহু শ্রমিক শিল্পকারখানায় কাজের সুযোগ পাবে এবং তার দ্বারা কৃষিজীবীর সংখ্যা লাঘব হবে। কৃষিজীবীর সংখ্যা কম হলে প্রতি পরিবারের পক্ষে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণের উপযুক্ত চাষের জমি পাওয়া সম্ভব হবে। কৃষিক্ষেত্রের আয়তন বৃদ্ধি পাবে এবং তাতে বৃহদায়তন কৃষি ব্যবসায়ের পথ সুগম হবে। এই সমস্ত উপায়ে সাধারণ আর্থিক অবস্থাও উন্নত হবে। কারখানায় প্রস্তুত ব্যবহারিক পণ্যদ্রব্যগুলির বিনিময়ে শ্রমশিল্পীগণ চাষীদের কাছ থেকে কৃষিজাত দ্রব্য ক্রয় করবে। শিল্পের সাহায্যে প্রকৃষ্ট চাষের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সার প্রস্তুত হতে পারবে এবং এইভাবে শিল্প ও কৃষি পরস্পরের সহায়তা করে ক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করবে।

কিন্তু এই প্রয়োজনীয় কর্তব্য কী উপায়ে সম্পন্ন হতে পারে? বিরোধী লোকের দল শক্তিমান বাধা হয়ে কৃষির উন্নতির পথে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু একথা সত্য যে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে কোনো উন্নতির আশা করা যায় না। নিম্নলিখিত উপায়গুলি গ্রহণ করা হলে এদেশের চাষের এবং চাষীর উন্নতি সম্ভব:

১. যারা জমি চাষ করে একমাত্র তাদের হাতেই জমির স্বত্ব সমর্পণ।

২. ঐকত্রিক নীতিতে বৃহদায়তন কৃষির প্রবর্তন।

৩. দেশে বিস্তৃতভাবে শিল্প সংস্থাপন।

৪. কৃষিতে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগ।

এই উপায়গুলি অনেকের কাছে অসম্ভব মনে হতে পারে কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়াতে এই নীতিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে এবং অপ্রত্যাশিত ফললাভ হয়েছে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার চাষীশ্রেণীর অবস্থা বর্তমান বাংলাদেশের চাষীর অবস্থার চেয়ে কোনো অংশে উৎকৃষ্টতর ছিল না। সমান দারিদ্র্যে ও দুঃখ-কষ্টে তারা দিনপাত করত এবং একই প্রাচীন প্রথায় চাষের কাজ হত। দেশের অতি উর্বর ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ একর জমি ছিল ২৮,০০০ ধনী মালিকের হাতে আর ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ একর জমি ছিল ১ কোটি চাষী পরিবারের অধীনে এবং সে জমির অনেক অংশ অত্যন্ত অনুর্বর ছিল। শতকরা ৩০ ভাগ চাষীর লাঙলটানার ঘোড়া ছিল না, ৩৪ ভাগের যন্ত্রপাতি ও ১৫ ভাগের জমি ছিল না। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরে এই অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। জমির মালিকত্বের উচ্ছেদ হয় এবং যারা নিজে জমি চাষ করে তাদের হাতে জমির স্বত্ব অর্পণ করা হয়। ক্ষেত্রগুলি বৃহদায়তনের না হলে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ সম্ভব হয় না—সে কথা ছোটো ছোটো চাষীদের ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় এবং ১৯২৯ সালে বিপ্লবের ১২ বৎসরের মধ্যে ১০ লক্ষ চাষী পরিবার একত্র হয়ে ৫৭,০০০টি ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করে। ১৯৩৮ সালের মধ্যে তার সংখ্যা আরো অনেক বৃদ্ধি পায়, সে বৎসরে দেখা যায় ১ কোটি ৮৮ লক্ষ পরিবার ২৪৩,৩০০টি ক্ষেত্র স্থাপন করেছে। সেই সময়ের মধ্যে কর্ষণাধীন জমির শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশি ঐকত্রিক নীতিতে চাষ হতে থাকে। সোভিয়েট আইন ও নিয়মাবলীতে লিখিত

আছে যে ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রগুলির অধীনে যে চাষের জমি আছে সেই জমি চাষের কাজে ব্যবহারের জন্য বিনা ব্যয়ে অনির্দিষ্ট কালের অর্থাৎ চিরকালের জন্য দেওয়া হয়।

ঐকত্রিক কৃষির সঙ্গে সঙ্গে চাষের কাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯১০ সালে রাশিয়ায় এক কোটি কাঠের লাঙল, ১ কোটি ৭৭ লক্ষ কাঠের আঁচড়া চাষীরা ব্যবহার করত, কিন্তু ১৯৩৮ সালে ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রগুলিতে ৪,৮৩,৫০০টি ট্র্যাক্টার, ১,৫৩,৫০০টি কম্বাইন এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি চাষের কাজে নিযুক্ত হয়। উক্ত প্রকারের কৃষিক্ষেত্রগুলির জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে বড়ো বড়ো শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়েছে। ১৯৩১ সনের প্রারম্ভে ৬,৩৫০টি ট্র্যাক্টার ও যন্ত্রমেরামতকারী প্রতিষ্ঠান ছিল ও দেশের সর্বত্র সকল ঐকত্রিক ক্ষেত্রগুলির চাহিদা পূরণ করে। স্টালিনগ্রাড ও চিলিয়াবিনস্কে ট্র্যাক্টারের ও সারাটভ, জ্যাপোরোজিয়ে এবং রস্টভে শস্যছেদনকারী কম্বাইনের বড়ো বড়ো যন্ত্রশালা নির্মিত হয়েছে।

ঐকত্রিক ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আদর্শে চাষের কাজ পরিচালিত হয়। তার দ্বারা যে লাভ হয় তার থেকে রাষ্ট্রের পাওনা মিটিয়ে বাকি অংশ সমবায় সমিতির সকলের মধ্যে ভাগ হয়। পরের উপার্জিত অর্থে প্রতিপালিত ও আলস্যে দিন যাপন করে এমন লোকের শ্রেণী রাশিয়াতে লোপ পেয়েছে। সে কারণে সেখানকার চাষী নিজের কাজ আরো উৎসাহের সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে, যেহেতু সে জানে যে পরিশ্রমের দ্বারা সে নিজের অবস্থাই উন্নত করতে সমর্থ হবে। তার শ্রমের ফলে অংশীদার কেউ নেই। চাষীদের কোনো কারণে অবস্থা খারাপ হলে তার সুবিধা গ্রহণ করবে (যেমন মহাজন) এমন লোক সে দেশে নেই এবং দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুর্যোগের ভয়ও বিজ্ঞানের সাহায্যে

দূর হয়েছে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সকল ঐকত্রিক ক্ষেত্রগুলির আয় হয়েছিল ১,৮৩০ কোটি রুব্‌ল। ১ কোটি ৮৮ লক্ষ পরিবারের মধ্যে সে আয় ভাগ হলে প্রতি পরিবার বৎসরে প্রায় ১,০০০ রুব্‌ল করে পায় (১ রুবল=১·৪ টাকা); ব্যক্তিগত কৃষিশ্রমিকদের আয়ও অনেক হয়। রাষ্ট্রের অধীন কৃষিক্ষেত্রগুলিতেই যে শ্রমিকগণ সর্বদা কাজ করে ১৯৩৮ সালে দেখা যায় তারা প্রত্যেক বৎসরে গড়ে ২,৩৯৬ রুব্‌ল করে উপার্জন করেছে। সরকারী শূকর প্রজননকার্যে প্রত্যেক শ্রমিক গড়ে ২,৪৯৯ রুব্‌ল, মেষ পালন ও প্রজননকার্যে ২,২৭৮ দুগ্ধ ও মাংস তৈয়ারী ২,২১৯ এবং শস্য উৎপাদনে ২,৭৪২ রুব্‌ল বৎসরে আয় করে। ওই সালের ট্র্যাক্টার-চালকগণ ও দুগ্ধশালার নারীকর্মীগণ মাসে ১৭৪ রুব্‌ল করে পায়। অত্যন্ত নিপুণ কর্মীরা আরো বেশি পায়। ১৯৩৮ সালে একটি ট্রাক্টর-চালক বেরিচ ৬ মাসে ৫,৫০০ রুব্‌ল এবং মস্কোর নিকট একটা সরকারী দুগ্ধশালায় ২টি নারীশ্রমিক ৮০০-১,০০০ রুব্‌ল রোজগার করে। এই আয়ের অঙ্কগুলি অত্যন্ত অধিক সন্দেহ নেই কিন্তু এই আয়ের ফলে চাষীদের যতখানি সুখসুবিধা লাভের সম্ভাবনা প্রকৃতপক্ষে তার চেয়েও বেশি সুখে ও স্বচ্ছন্দে তারা জীবনধারণ করে। তাদের জন্য বিনা ব্যয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা আছে।

এদেশের লোকের কাছে এ সকলই বিস্ময়কর বলে বোধ হবে। ২৫ বৎসর পূর্বে রাশিয়ার চাষীদের কাছেও এ কল্পনা অতীত ছিল। কিন্তু ২৫ বৎসরের কম সময়ের মধ্যে সমস্ত দেশের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। মুজিকদের ঘোড়ায়-টানা কাঠের লাঙলে চষা অসংখ্য ছোটো ছোটো ক্ষেত্রগুলির স্থানে বড়ো বড়ো ঐকত্রিক ক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে এবং ট্র্যাক্টার ও কম্বাইনের সাহায্যে ফসলের চাষ হচ্ছে। এ আমাদের দেশেও হতে পারে। রাশিয়াতে যা সম্ভব হয়েছে এদেশেও তাই

সম্ভব। সেই একই সময়ের মধ্যেই চাষীদের সমান অবস্থায় আনা যেতে পারে যদি উক্ত উপায়গুলি প্রয়োগ করা যায় এবং কি প্রকারে তা সম্ভব হতে পারে তা বিবেচনা করা দরকার।

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ